বিজ্ঞান মেলা

ছোটদের জন্য বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম পাক্ষিক বিজ্ঞান পত্রিকা

জানুয়ারী ১৯৮০
পৌষ ১৩৮৯
দু' টাকা পঁচিশ পয়সা

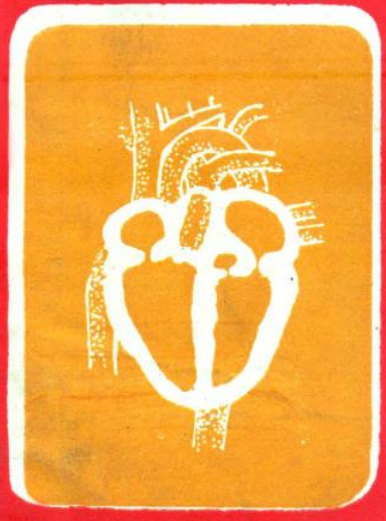

খরার জন্য কি সূর্য দায়ী ?
দক্ষিণ মেরু সমুদ্রের বরফমাছ
জাপানীরা কি সবচেয়ে বুদ্ধিমান ?
তাপ ফটোগ্রাফীর ব্যাপারস্যাপার
যাযাবর মাছেদের কাণ্ডকারখানা
বিজ্ঞানে এবারের নোবেল পুরস্কার

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

১। গ্রাহকরা ঘরে বসেই 'বিজ্ঞান-মেলা' পেতে পারো। এবারে বিজ্ঞান-মেলার গ্রাহক চাঁদা বাড়লো। সডাক চব্বিশ টাকা। সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে নিলে বাইশ টাকায় সারা বছর বই পাবে (শারদীয়া সংখ্যা সহ)। যারা গ্রাহক আছ তারা বাইশ টাকা পাঠালেই নতুন গ্রাহক হয়ে যাবে।

২। ডাকে নিলে পঁচিশ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয়না। অন্যান্য নিয়মকানুন চিঠি দিলে জানানো হবে।

৩। যারা লেখা পাঠাতে চাও "তোমাদের লেখা" বিভাগে তারা পৃষ্ঠার একদিকে পরিষ্কার করে কপি করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিও।

৪। মনে রেখো এবারে আমাদের সম্পাদকীয় দপ্তর : ৫৩সি, মতিলাল নেহেরু রোড, কলকাতা-২৯। এছাড়া কলকাতা ও উত্তর শহরতলীতে আমাদের দুটি যোগাযোগ কেন্দ্র থাকছে 'স্কীন টেক্স' ২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা-৬ ও ১৭৩, অশোকগড়, কলকাতা-৩৫।

৫। এজেন্টদের কমিশন ২৫% প্রচলিত নিয়মকানুন অনুসারে।

বিজ্ঞান-মেলা রেজিষ্ট্রেশন নং ৩৭৩০৬/৮১

১। প্রকাশকের নাম — অসীম চক্রবর্তী
জাতীয়তা — ভারতীয়
ঠিকানা — ১৭৩, অশোকগড়, কলকাতা-৩৫

২। প্রকাশের স্থান — ১৭৩, অশোকগড়, কলকাতা-৩৫

৩। প্রকাশের কালক্রম — মাসিক

৪। মুদ্রাকরের নাম — হরিপদ পাত্র
জাতীয়তা — ভারতীয়
ঠিকানা — সত্যনারায়ণ প্রেস, ১, রমাপ্রসাদ লেন, কলকাতা-৬

৫। সম্পাদকের নাম — ডঃ অমিত চক্রবর্তী
জাতীয়তা — ভারতীয়

৬। স্বত্বাধিকারীর নাম — সুতপা চক্রবর্তী
জাতীয়তা — ভারতীয়
ঠিকানা — ৫৩সি, মতিলাল নেহেরু রোড, কলকাতা-২৯

আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে উপরিউক্ত তথ্যগুলি জ্ঞানতঃ সত্য।

অসীম চক্রবর্তী

বিজ্ঞান মেলা—বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম মাসিক বিজ্ঞান-পত্রিকা। সি. এস. আই. আর. কর্তৃক স্বীকৃত একমাত্র বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকা।

□

সম্পাদক

অমিত চক্রবর্তী
সুভাষ সান্যাল

□

সম্পাদকীয় দপ্তর

৫৩ সি, মতিলাল নেহেরু রোড,
কোলকাতা-৭০০০২৯
ফোন—৪৭-৬৯৮০

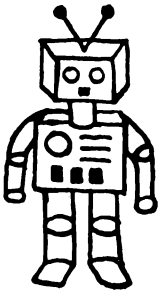

□

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা
২৪ টাকা (সডাক)

অসীম চক্রবর্তী কর্তৃক ১৭৩, অশোকগড় কোলকাতা-৭০০০৩৫ থেকে প্রকাশিত এবং সত্যনারায়ণ প্রেস,১, রমাপ্রসাদ রায় লেন, কোলকাতা-৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত।

জানুয়ারী ১৯৮৩ * ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা * পৌষ ১৩৮৯

বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প

পিঁপড়ে পুরাণ | প্রেমেন্দ্র মিত্র ৯
প্রতিদ্বন্দ্বী | হীরেন চট্টোপাধ্যায় ১১

সায়েন্স ফিক্‌সন্

গ্রীণ থাম্‌ব্‌ | ক্লীফোর্ড সীম্যাক্‌ ১৫

জ্ঞান-বিজ্ঞান

বিশ্ব জুড়ে বিচিত্র প্রাণ | কৃষ্ণা ঘোষাল ৭
তাপ ফটোগ্রাফী | পার্থসারথী চক্রবর্তী ২১
কেক পাঁউরুটির কথা | সতী চক্রবর্তী ২২
হাতিয়ার থেকে যন্ত্র | মির্জা নৌশাদ ২৫
দক্ষিণ মেরু সমুদ্রের বরফ মাছ | অজিতকুমার সরকার ২৭

আবিষ্কারের পিছনে

ব্যাঙের পা নাচলো বলে··· | যুগলকান্তি রায় ৩৫

অনুবাদ

পরমাণু শক্তির গল্প | লরা ফেমি ১৮

তোমাদের লেখা

ধূমকেতু | মালবিকা দে ৪১

নিয়মিত বিভাগ

বিজ্ঞানের খবর ৩ যা নিয়ে এখন হৈ চৈ ৬ মনের জানালা ৩১
শরীর-স্বাস্থ্য ৩৩ নিজে করো ৩৮ জেনে রাখা ভাল ৩৯
অবিশ্বাস্য ! ৩৭ জানো কি ? ৩৮ কোনো সময়ে ৪৪ ধাঁধা ৪৬

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ | প্রদীপ বিশ্বাস

আমাদের কথা

একটা বছর শেষ হয়ে গেল, নতুন বছরের শুরু। বিজ্ঞান-মেলাও আর একটা বছরে পা দিল, প্রথম দুটো বছর পেরিয়ে তৃতীয় বছরে পা রাখলো সে। গত ১৯৮২ সালে বিজ্ঞান-মেলা নানা ঝড়-ঝাপটা পেরিয়েছে, তবে সব থেকে বড় ধাক্কাটা এসেছে গত ৮ই ডিসেম্বর। ঐদিন বিজ্ঞান-মেলার অন্যতমা সম্পাদিকা কৃষ্ণা ঘোষাল আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন চিরদিনের মতো।

জনপ্রিয় বিজ্ঞান-লেখিকা কৃষ্ণা ঘোষাল, সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন কৃষ্ণাদি নামেই। জন্ম ১৯৪৯, ছোটবেলা পুরোটাই কেটেছে মুর্শিদাবাদ বহরমপুরে। প্রাথমিকভাবে রসায়ন বিভাগের ছাত্রী হলেও তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও মহাকাশ-বিজ্ঞানের নানা শাখায়। তোমরা হয়ত জানো না, গত দু বছরে বিজ্ঞান-মেলায় যতগুলো লেখা প্রকাশিত হয়েছিল তার ওপর এক সমীক্ষা চালানো হয়েছিল পত্রিকার তরফ থেকে। ঠিক করা হয়েছিল শ্রেষ্ঠ লেখক বা লেখিকা যিনি হবেন তাঁকে বিজ্ঞান-মেলার তরফ থেকে একটা পুরস্কারও দেওয়া হবে। মজার কথা বিচারকেরা অনেকেই জানিয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ লেখাটি 'বিশ্বজুড়ে বিচিত্রপ্রাণ' এই পর্যায়ে যাঁর লেখিকা ছিলেন কৃষ্ণা ঘোষাল স্বয়ং! যেহেতু সম্পাদিকা—শ্রেষ্ঠ লেখার পুরস্কার তাঁকে দেওয়া যায় না, সুতরাং কৃষ্ণাদির ইচ্ছা ছিল পশুপ্রাণীর বিচিত্র আচার আচরণ নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হোক। এই সংখ্যায় তোমরা দেখতে পাবে আমরা তাঁর সেই ইচ্ছাই বাস্তবরূপ দেবার চেষ্টা করছি।

বিজ্ঞান-মেলা তার তৃতীয় বছরে পা দিল কিন্তু আর আমরা কোনদিনও সেই নিবিষ্টমনে চুপচাপ কাজ করে যাওয়া কৃষ্ণাদিকে তাঁর টেবিলে দেখতে পাবো না। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে আমাদের ছেড়ে হঠাৎই চলে গেছেন তিনি। তবে হাঁ, কৃষ্ণাদি না থাকলেও 'বিশ্বজুড়ে বিচিত্রপ্রাণ' আরও বেশ কিছুদিন তোমরা দেখতে পাবে বিজ্ঞান-মেলার পাতায়, যা তিনি নিজে লিখে রেখে গেছেন বা তাঁর সংগ্রহ করা তথ্যের নোটবই-র পাতা থেকে নিয়মিতভাবে তোমাদের নামনে হাজির করবো আমরা।

নতুন বছর শুরু হলো, বিজ্ঞান-মেলার তরফ থেকে অনেক অনেক প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানিয়ে তোমাদের বলি নতুন ভাবে, নতুন করে, নতুন উৎসাহে তোমরা এগিয়ে চলো।

ছোট্ট বন্ধুরা,
একান্ত নিরুপায় হয়ে বিজ্ঞান মেলা'র দাম বাড়াতে হ'ল—তবে সেই সঙ্গে ১২টা করে পাতাও কিন্তু বাড়ছে। আর হ্যাঁ, দাম বাড়া সত্ত্বেও 'বিজ্ঞান মেলা'কে ছোটদের জন্য চালু পত্রিকাগুলির মধ্যে সবচেয়ে কম দামে পাচ্ছো। অনিবার্য কারণে দাম বাড়ানোর ব্যাপারটা তোমাদের আগেভাগে জানাতে পারি নি। এর জন্য আমরা দুঃখিত।

খবর

গাছেদের রোগ

তোমরা জেনে খুব অবাক হবে যে মানুষ আর গাছপালার মধ্যে বহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মানুষের অসুখ করে, গাছেরাও তার ব্যতিক্রম নয়। মানুষ তার রোগের কথা মুখে বলতে পারে কিন্তু গাছেদের বেলায়? বিজ্ঞানীদের মতে গাছেরাও তাদের রোগের কথা জানায়, কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারি না। মাটিতে নুন বেশি থাকলে, কিংবা পোকামাকড়, বায়ূদূষক ছত্রাক ভাইরাসের আক্রমণ—এসব কিছুর বিরুদ্ধেই গাছেরা সাড়া দেয়, সময় সময় রোগের আক্রমণে বনের পর বনের বিশেষ ধরনের গাছ উজাড় হয়ে যাবার ঘটনাও বিরল নয়। অথচ রোগ আক্রমণের শুরু থেকেই কিন্তু এর আভাস গাছেরা নিজেরা দেয়। New York State universityর বন সংরক্ষণ পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে আকাশ থেকে infrared colour photography. এ ব্যাপারে বিশেষভবে সাহায্য করতে পারে। এই পদ্ধতির সাহায্য সুস্পষ্টভাবে সুস্থ ও রোগাক্রান্ত গাছের পাতার রং-এর তফাৎ করা সম্ভব এবং রোগলক্ষণ দেখা দেবার সংগে সংগে তার প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিয়েই বহু গাছকেই তাঁরা ইতিমধ্যে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছেন। ঠিক একইভাবে চিন্তা করে চলেছেন কলম্বিয়ার মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ের Ellis Graham তিনি এমন এক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যা দিয়ে যে কোন গাছের পাতায় জলের চাপ এবং ক্লোরোফিলের মাত্রা তাৎক্ষণিকভাবে বোঝা সম্ভব। এর থেকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাবে ঐ গাছটির জলের চাহিদা কতটা, কি হারে তার বাষ্পমোচন হচ্ছে এবং খাদ্য তৈরীর ব্যাপারে সে কতটা সক্রিয়। বিভিন্ন এলাকায় গাছপালার ওপর সমীক্ষা চালিয়ে গবেষকদল এখন একটি রিপোর্ট তৈরি করছেন যার ভিত্তিতে পরবর্তীকালে জমিতে সেচ ব্যবস্থা এবং সার ব্যবহার পদ্ধতির বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়তো সম্ভব হবে।

সৌর ঝড়

না, এটা কোন সাধারণ ঝড় বৃষ্টি নয়, সৌরঝড় আরও বড় ব্যাপার। বেতার সম্প্রচারে এই সৌরঝড় বেশ ঝামেলা সৃষ্টি করে। তাই বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন খুবই। সৌরঝড়ের অনেকটাই বিজ্ঞানীদের জানা, অনেকটাই অজানা। এই পরিপ্রেক্ষিতে National Aeronautics and Space Administratien সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আলামী ১৯৮৫ সালে তারা সৌরঝড়ের প্রভাব অনুকরণ করে আয়নমণ্ডলে কয়েকটি ছিদ্র করবেন এবং সেই পরিস্থিতিতে বেতার সংযোগ ব্যবহারের পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করা হবে। এই পরীক্ষায় মহাকাশ ফেরী বা স্পেস্ সাট্‌লের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে কারণ আয়নমণ্ডলে ছিদ্র করা হবে স্পেস্ সাট্‌ল দিয়েই। দেখা গিয়েছে কোন মহাকাশযান যখন আয়নমণ্ডল ভেদ করে উঠে যায় তার জ্বালানী নির্গম নল থেকে বেরিয়ে আসা CO_2, হাইড্রোজেন ও জলীয় বাষ্প আয়নমণ্ডলে আহিত কণাদের নিষ্ক্রিয় করে আয়নমণ্ডলে ছিদ্র তৈরী করে। এ ঘটনা প্রথম জানা গিয়েছিল ১৯৭৩ সালে যখন Skylab মহাকাশে তোলা হয়েছিল। সেবার আয়নমণ্ডলে ছিদ্রটি ছিল প্রায় ৬২১ মাইল ব্যাসবিশিষ্ট, স্থায়িত্ব ছিল প্রায় তিনঘণ্টা। ১৯৮৫ সালের পরীক্ষাগুলো চালানো হবে—নির্দিষ্ট জায়গায়, মাটির ওপর গবেষণাগারগুলোর প্রয়োজনমাফিক। এই পরীক্ষা সফল

হলে স্পেস্ সাট্‌ল আর একবার প্রমাণ করবে, মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে তার অবদান কতখানি।

আইসক্রিম থেকে

শীত বা গ্রীষ্ম মেলা প্রদর্শনী হলেই ছেলে বুড়ো সকলের আইসক্রিম খাওয়ার বেজায় ঝোঁক দেখা যায়। ডাক্তাররা কিন্তু 'মোটা'দের আইসক্রিম খেতে নিষেধ করেছেন। কারণ 'ক্রিম' বা স্নেহপদার্থ শরীরে নানা বাড়তি উপসর্গ ডেকে আনতে পারে। "ব্লাড প্রেসার হওয়া", "কোলেস্টেরল"—মোটা লোকদের আইসক্রিম থেকে এইসব উপসর্গ হতে পারে। ইদানীং কালের James Zavoral ও তাঁর সহ-যোগীরা দেখেছেন, আইসক্রিমে যদি Locust Bean নামে বিশেষ এক ধরনের বীনের আঠা মেশানো যায় তাহলে খুব সুফল পাওয়া যেতে পারে। ২৮ জন রোগীর ওপর পরীক্ষা চালিয়ে Dr. Zavoral দেখিয়েছেন এই আইসক্রিম রক্তের কোলেস্টেরল কমিয়ে দেয়।

কৃত্রিম হাড়

ডালে ভেজাল, তেলে ভেজাল, ঘিয়ে ভেজাল···খাবারের প্রতিটি জিনিসে এখন ভেজালের রাজত্ব; কিন্তু তোমরা কি জানো অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও ভেজালের কারবার শুরু হতে চলেছে! ফ্লোরিডা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গবেষকরা সম্প্রতি তৈরী করেছেন এক ধরনের কৃত্রিম হাড়। কোয়ার্জ, বালি, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস অক্সাইড দিয়ে তৈরী এই কৃত্রিম হাড়ের নাম দেওয়া হয়েছে Bioglass। গবেষকদের মত হাঁটু, কনুই বা নিতম্বসন্ধির প্রতিস্থাপনে এই bioglass যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। এখন শুধু অস্থি চিকিৎসকদের হাতে এই কৃত্রিম হাড় আসার অপেক্ষা।

ক্ষত থেকে সাবধান

ক্যানসার শব্দটার একটু ভেঙে মানে করলে দাঁড়ায়—'সারতে পারে' কিন্তু এ রোগ সারে না। আর তাই ক্যানসার গবেষকদেরও পরীক্ষা নিরীক্ষার শেষ নেই। সম্প্রতি বোস্টনের Tufts বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ক্যানসার গবেষক বলেছেন আগের থেকে শরীরের কোন স্থানে কোন ক্ষত থাকলে ক্যানসার সৃষ্টিকারী বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থগুলি সেই স্থানের টিস্যুগুলিকেই আগে আক্রমণ করে। পরীক্ষাগারে তাঁরা একদল ইঁদুরের উপর পরীক্ষা চালিয়েছেন, পরীক্ষামূলকভাবে তাঁরা কিছু ইঁদুরের দাঁতে স্টীলের তার বেঁধে মুখের ভেতর ঘা'র সৃষ্টি করেন। এবং এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক N-Nitroso-N-Methylurea ইন্‌জেকশন দেন সবকটি ইঁদুরকে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যেসব ইঁদুরের মুখে আগের থেকেই ঘা ছিল তাদের বেশির ভাগেরই সেই ক্ষতস্থানে ক্যানসারের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যেসব ইঁদুরের শরীরে কোন ক্ষত ছিল না তাদের মধ্যে ক্যান-সারের রোগলক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে মুখে, গলায়, পাকস্থলীতে, যকৃতে। শরীরের যেখানে ক্ষতিকারক ইন্‌জেকশন দেওয়া হলো তার থেকে বহু দূরের কোন ক্ষতস্থানে ক্যানসার রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে তারা বলেছেন—হয়তো এইসব রাসায়নিক শরীরের বিশেষ কোন অঙ্গে গিয়ে সেখানকার এমন কোন রাসায়নিকের ক্ষরণ কমিয়ে বা বাড়িয়ে দেয় যে রাসায়নিকটি কোষ বিভাজনের হারকে নিয়ন্ত্রিত করে। যদি কোন কারণে রাসায়নিকটির কোষ বিভাজনের ক্ষমতা হারিয়ে যায় তবে সেক্ষেত্রে ক্ষত-স্থানে ব্যথা বা সামান্য খোঁচা উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে ঐ জায়গার কোষ বিভাজনের হার অস্বাভাবিক রকম বাড়িয়ে দেয়।

ব্যাকটিরিয়া থেকে ইনসুলিন

একটা খবর কি তোমরা জানো? এখন থেকে ডায়বেটিস রোগীদের বড় বন্ধু ব্যাকটিরিয়া। ভাবছ তো এ আবার কি হেঁয়ালী! তোমরা যারা বিজ্ঞানের খবরাখবর রাখো তাদের কাছে 'জিন' শব্দটি অপরিচিত নয়। এই জিনকে কাজে লাগিয়ে সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ব্যাকটিরিয়া থেকে ইনসুলিন তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। বৃটেনে 94 জন রোগীর ওপর এই ইনসুলিন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে, পরীক্ষার রিপোর্টে জানা গেছে ব্যাকটিরিয়া থেকে পাওয়া ইনসুলিন আর প্রাণীদেহের অগ্ন্যাশয় থেকে পাওয়া

ইনসুলিনের মধ্যে কার্যগত কোন পার্থক্য নেই বরং এই ইনসুলিনের প্রয়োগ একটা বাড়তি সুযোগ দেবে—সে সব রোগীর দেহে প্রাণীজ ইনসুলিন নানারকম এ্যালার্জির সৃষ্টি করে, ব্যাকটিরিয়ার ইনসুলিন তাদেরকে সেসব ঝামেলা এড়াতে সাহায্য করবে। তবে এই ইনসুলিনের দাম বাজারে চালু ইনসুলিনের থেকে একটু বেশীই হবে।

বদমেজাজীদের জন্য

বদমেজাজের সাথে খাবারদাবারের কি কোন সম্পর্ক আছে? প্রশ্নটা অদ্ভুত হলেও ওয়াশিংটনের Institute for Biosocial Researchর গবেষক Alexender Schanss বলছেন খাবারে দস্তার পরিমাণের তারতম্যের উপর খিটখিটে মেজাজ নাকি নির্ভরশীল। সাধারণতঃ প্রতিদিন খাবারের সাথে আমাদের দেহে দস্তা ঢোকে এক মিলিগ্রামের হাজার ভাগের এক ভাগ। কিন্তু কোন কারণে যদি খাবারে দস্তার ঘাটতি দেখা দেয় তবে নুন আর চিনি খাবার ইচ্ছেটা বেড়ে যায় কিন্তু সেই সাথে শাকশব্জি খাওয়ার ইচ্ছেটা যায় কমে। আর শাকশব্জি যথেষ্ঠ পরিমাণে না খেলে কিছু বিশেষ ভিটামিনের অভাবে মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু কোষের কার্যক্ষমতা যায় কমে—আর তখনই মেজাজ ক্রমশ খিটখিটে হয়ে ওঠে। বদমেজাজী বলে অখ্যাতি আছে তাদের কাছে এটা একটা সুখবর বই কি!

পদার্থ বিজ্ঞানে এবারের নোবেল পুরস্কার

তোমরা নিশ্চয় জান যে সুইডেনের রয়াল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স প্রত্যেক বছর বিভিন্ন বিষয়ের উপর নোবেল পুরস্কার দিয়ে থাকেন। ১৯৮২ সালে এককভাবে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন নিউইয়র্কের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কেনেথ জি, উইলসন।

কেনেথ জি, উইলসন তাঁর গবেষণার জন্য যে বিষয়কে বেছে নিয়েছেন গত শতাব্দী থেকেই তা নিয়ে প্রচুর কাজ হয়েছে। আমাদের হাতের কাছেই, আশেপাশে যে সব বস্তু আছে তাদের বিভিন্ন দশা এবং বিভিন্ন কাজ সম্বন্ধে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন অধ্যাপক উইলসন এবং এখনও করছেন।

তাহলে ব্যাপারটা তোমাদের একটু খুলেই বলি।

তোমরা নিশ্চয় জান যে সাধারণভাবে কোনো বস্তুর তিন রকম অবস্থা বা দশা থাকতে পারে—কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয়। আবার কোন বস্তু কোন অবস্থায় থাকবে তা নির্ভর করে চাপ এবং তাপমাত্রার উপর। এই চাপ আর তাপমাত্রার সঙ্গে ওতঃপ্রোত সম্পর্ক করেছে আয়তনের। তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ চাপ অপরিবর্তিত রেখে যদি তাপমাত্রা বাড়ানো যায় তাহলে তরল এবং বিশেষ করে গ্যাসের আয়তন বাড়ে, তাপমাত্রা কমালে আয়তন কমে।

তাপমাত্রা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বস্তু এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। যেমন ধরো বরফকে গরম করলে জলে এবং জলকে ফোটালে বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। তবে তাপমাত্রা বাড়ালেই যে সমস্ত তরল গ্যাসে বা চাপ বাড়ালেই যে গ্যাসের আয়তন কমে তরল অবস্থায় পরিণত হবে তা কিন্তু নয়। কোনো বস্তুকে এক অবস্থা থেকে অন্য এক অবস্থায় পরিবর্তিত করতে গেলে কতকগুলো শর্ত মেনে চলতে হয়। যেমন ধরো চাপ যতই বাড়ানো হোক না কেন, আয়তনও যেমনই থাকুক একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসকে নামিয়ে না নিলে সেই গ্যাসকে তরল করা যাবে না। এই তাপমাত্রাকে বলা হয় সংকট তাপমাত্রা। ঠিক সেই রকমই গ্যাসকে তরলে রূপান্তরিত করতে গেলে একটা নির্দিষ্ট চাপের দরকার যার নীচে হলে অবস্থার পরিবর্তন হবে না। সেই চাপকে বলা হয় "সংকট চাপ"।

এই তাপ, চাপ বা আয়তন ছাড়াও বস্তু কখন কোন দশায় থাকবে তা নির্ভর করে পরমাণুর ভিতর ইলেকট্রন কণার আচরণের উপর। ইলেকট্রন কণাগুলো পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সব সময় ঘুরছে। এদের কোনোটা থাকে নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি। এই পরিমণ্ডলের ইলেকট্রনগুলোকে বলা হয় Surface electron এবং তাপের প্রভাবে এইসব ইলেকট্রনগুলো কিভাবে আচরণ করে তা নির্ধারিত করে বস্তুর দশা।

(এর পর ৮ পাতায়)

যা নিয়ে এখন হৈ চৈ

খরার জন্য কি সূর্য দায়ী ?

যে বছরটা সবেমাত্র শেষ হ'ল—বাংলার চাষীদের কাছে তা দুঃখের বছর, আকালের বছর। পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া জেলার ক্ষেতখামার এবার খরার আগুনে পুড়ে খাক্! আশ্চর্যের ব্যাপার, পশ্চিমবাংলায় যখন খরার তাণ্ডব চলছে—তখন উড়িষ্যা আর গুজরাটের বেশ কিছু উপকূল অঞ্চল বন্যার কবলে! খরা-বন্যার সঙ্গে সূর্যের একটা বড় রকমের সম্পর্ক আছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, সূর্যের গায়ের কালো ছোপগুলি, যাকে বলা হয় সৌরকলঙ্ক—তাদের সংখ্যার পরিবর্তনের সাথে আবহাওয়ার একটা সম্পর্ক আছে। বিজ্ঞানীরা হিসেব কষে দেখেছেন সূর্য পৃষ্ঠের তাপমাত্রা যেখানে ৬০০০° কেলভিন, যেখানে ঐ কালো ছোপ ছোপ অংশের তাপমাত্রা ৪০০০° কেলভিনের কাছাকাছি এবং এদের ব্যাস দশহাজার থেকে দেড় লক্ষ কিলোমিটারের মধ্যে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, বছর বছর সৌরকলঙ্কের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে একটা বছরে এসে তা আবার কমতে শুরু করে। বিজ্ঞানীদের নিশ্চিত ধারণা—সৌরকলঙ্কের এই সংখ্যাগত পরিবর্তন হয় ১১ কিংবা ২২ বছরের চক্রে। গত আড়াইশো বছরে দেখা গেছে, প্রতি তৃতীয় কিংবা চতুর্থ বছরে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা হয় সবচেয়ে বেশী। তারপর তা কমতে কমতে ৭ম কিংবা ৮ম বছরে হয় সবচেয়ে কম, তারপর আবার তা বাড়তে শুরু করে। আমাদের দেশ ছাড়াও অন্য বহু দেশে দেখা গেছে, সৌরকলঙ্কের সংখ্যা যে বছর সবচেয়ে বেশী হয়, সে বছর দেখা দেয় বর্ষণ; এবং যে বছর সৌরকলঙ্কের সংখ্যা সবচেয়ে কম—সে বছর চলে খরা।

এই প্রসঙ্গে বলি, ১৭০০ সাল থেকে পৃথিবীতে যে ৬৮টা বড় রকমের দুর্ভিক্ষ হয়েছে তার মধ্যে ২৯টাই ঘটেছে নিম্নতম সৌরকলঙ্কের বছরগুলিতে, অর্থাৎ যে বছরগুলিতে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে কম। ১৮৬৬ সাল থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে ৮টা বিশ্বজোড়া দুর্ভিক্ষ ঘটেছে এই নিম্নতম সৌরকলঙ্কের বছরগুলিতে। বাংলাদেশের বিয়াল্লিশের মন্বন্তরও এর মধ্যে পড়ে।

কেন এমন হয়, কেন সৌরকলঙ্কের সংখ্যা বাড়লে পৃথিবীর বেশ কিছু অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়ে তা নিয়ে বহু বিজ্ঞানী আজ ভাবনা চিন্তা করছেন। অনেক বিজ্ঞানীর মতে, সৌরকলঙ্ক-ক্রমের সাথে সৌর ঝঞ্ঝার বাড়া-কমার সরাসরি সম্পর্ক আছে। সৌরঝঞ্ঝার ফলে সূর্যপৃষ্ঠ থেকে অগ্নিশিখা সূর্যের গা থেকে ৫০ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত ছুটে বেরিয়ে আসে। এই সময়ে সূর্য থেকে নানা ধরনের তড়িৎ কণিকা প্রচুর পরিমাণে ছুটে আসে পৃথিবীর দিকে। তবে পৃথিবীর আয়নমণ্ডল এবং ভ্যান অ্যালেন বেল্টে বাধা পাওয়ার ফলে তা পৃথিবীতে সরাসরি পৌঁছোতে পারে না। দেখা গেছে যে বছর সৌরকলঙ্কের সংখ্যা হয় সবচেয়ে বেশী—সে বছর সৌরঝঞ্ঝার পরিমাণও সেই অনুপাতে বাড়ে। এর ফলে আয়নমণ্ডলে চৌম্বক কণার পরিমাণ বেড়ে যায় এবং বায়ুমণ্ডলও অশান্ত হয়ে ওঠে। বায়ুমণ্ডল বিক্ষুব্ধ হলে ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রপাত ঘটে, আর তার মানেই তো বন্যা প্লাবন! ঠিক উল্টো অবস্থায় নিম্নতম সৌরকলঙ্কের বছরগুলিতে বায়ুমণ্ডল থাকে শান্ত-স্থির; বৃষ্টি হয় কম—ফলে দেখা দেয় খরা।

প্রশ্ন তবু থেকেই যায়। কেন তাহলে পৃথিবীর এক জায়গায় যখন খরা চলে, তখন অন্য জায়গা ভেসে যায় বন্যায়? সত্যি বললে, বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর এখনও জানেন না।

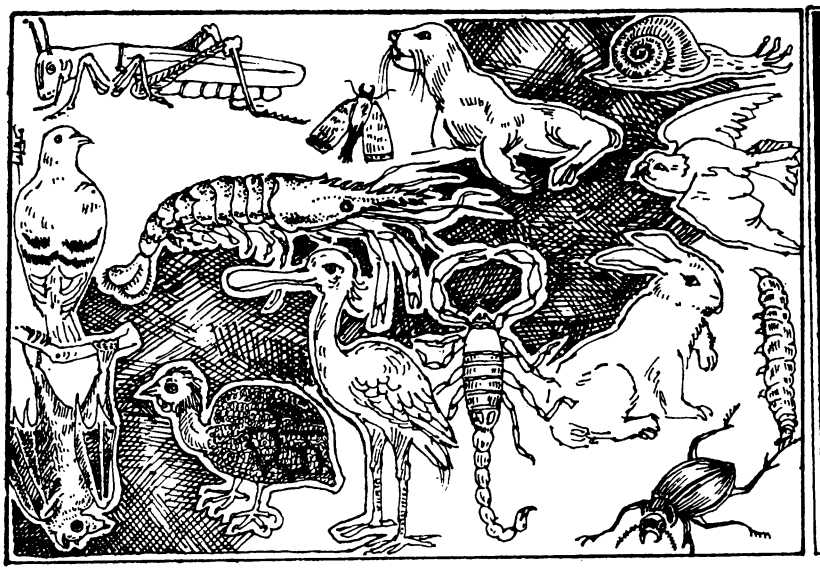

বিশ্বজুড়ে বিচিত্র প্রাণ

কৃষ্ণা ঘোষাল

শরতের দিনগুলোর পর যেই হিমেল হাওয়া বয়—অমনি আমাদের চারপাশের মাঠ-ঘাট-জলায় উড়ে আসে খঞ্জন, টিট্টিভ, মাণিকজোড়, কাদাখোঁচা আর নানা ধরনের হাঁস। আসলে ওরা দেশান্তরী পাখী—নিজেদের দেশ হয়তো সুদূর মেরুরাজ্যে। শীতের শুরুতে যখন মেরু অঞ্চল পুরু বরফে ঢেকে যায় তখন ঝাঁক বেঁধে ঐসব পাখী উড়ে আসে অপেক্ষাকৃত গরম দেশগুলিতে। জানো বোধহয়, পাখীদের মধ্যে দীর্ঘতম পথ পাড়ি দেয় সুমেরুর গাঙ্‌চিল। সুমেরুর ৮২ ডিগ্রি অক্ষাংশ থেকে যাত্রা শুরু করে ইয়োরোপ ও আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে কুমেরুর ৭৪ ডিগ্রি অক্ষাংশে গিয়ে যাত্রা শেষ করে ওরা। বিশাল এই যাত্রাপথের দৈর্ঘ্য ২১ হাজার কি. মি.। শীতের শেষে আবার ওই পথ অতিক্রম করে নিজেদের জন্মভূমিতে ফিরে যায় ওরা।

দেশান্তরী পাখীদের মত সাগর পথ পাড়ি দিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যায় নানা প্রজাতির মাছ আর সামুদ্রিক প্রাণী। স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, এইসব সমুদ্র যাত্রীদের চলতে হয় মহাসাগরীয় স্রোত ধরে। অবশ্য ছোট ছোট উদ্ভিদ আর প্লাংকটন নামের প্রাণীরা ঝাঁক বেঁধে সমুদ্রজলের ওপর নীচে যাতায়াত করে—স্রোতের তোয়াক্কা না করেই। রাতের বেলায় এরা সমুদ্রের উপরদিকে উঠে আসে আর দিনের বেলায় চলে যায় সমুদ্রের গভীরে।

ঈল মাছেদের ব্যাপারটা ভারি মজার। সোভিয়েত রাশিয়ার বাল্টিক এলাকার নদী এবং হ্রদগুলিতে যেসব ঈল ঘুরে বেড়ায়, বয়স বাড়ার সাথে সাথেই তারা সমুদ্রে পাড়ি জমায়। নদীতে বাঁধ দিয়ে ঈলের ঝাঁককে আটকানো যায় না। এমন কি শিশিরে ঢাকা ঘাসজমির উপর দিয়ে এদের চলে যেতেও দেখা গেছে। এইসব ঈলেরা বাল্টিক সাগরে পড়েই যাত্রা শুরু করে উত্তর সাগরের দিকে। বিভিন্ন প্রণালী ধরে উত্তর সাগরে পৌঁছে এরা যাত্রাপথকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে চলে যায় অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরের দিকে। মধ্য অ্যাটল্যান্টিকে যে এলাকাটির নাম 'সারগাসো' সাগর'—সেখানে গিয়ে ডিম পাড়ে ওরা। মজার ব্যাপার—ডিম ফুটে বেরিয়ে বাচ্চা ঈল উল্টোপথে যাত্রা শুরু করে। বাল্টিক সাগরে পৌঁছতে পৌঁছতে বাচ্চা ঈলের বয়স হয়ে যায় তিন বছর। বাল্টিক সাগরে পৌঁছনোর পর তাদের বাবা মা যে নদী বা হ্রদ থেকে এসেছে ঠিক সেই নদী বা হ্রদে ঢুকে পড়ে ওরা। কিছুদিন পর যখন বয়স বাড়ে, বাবা-মা'র মতন ওরাও একদিন আবার যাত্রা শুরু করে সাগরের দিকে।

এইরকমই আর এক ধরনের পর্যটক মাছ হ'ল সীল। সীল মাছের কথা মনে হলেই আমাদের চোখের সামনে চির-তুষারের রাজ্য মেরু অঞ্চল ভেসে ওঠে। আমরা শুনেছি মেরু অঞ্চলের এস্কিমোরা বরফ খুঁড়ে হারপুণ দিয়ে ঈল মাছ শিকার করে। কিন্তু শুধু মেরু অঞ্চলেই নয়, যথেষ্ঠ সংখ্যায় সীল মাছেদের বাস করতে দেখা গেছে উত্তর মহাসাগর থেকে শুরু করে ক্যাস্পিয়ান সাগরেও যেখানকার জল বেশ গরমই বলা চলে। মজার ব্যাপার হল—ক্যাস্পিয়ান সাগরের সীলমাছেরা তাদের পূর্বপুরুষদের মত শীতের সময়ে সাগরের বরফে ঢাকা উত্তরাঞ্চলে গিয়ে শাবক প্রসব করে।

সীল মাছেরই একটা বিশেষ প্রজাতির নাম 'সন্ন্যাসী সীল'। বহুদিন আগে এরা দক্ষিণ মেরুতে বসবাস করলেও পরে চলে আসে ভূমধ্য সাগর অঞ্চলে। দু'শ বছর আগেও এসে ঝাঁক বেঁধে ঘুরের বেড়াত ভূমধ্য সাগরের নানা জায়গায়। এখন অবশ্য ভূমধ্য সাগরে এদের এক আধটাকেই দেখতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ সীলমাছই চলে গেছে আফ্রিকার অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরের উপকূল অঞ্চলে। সন্ন্যাসী সীল মাছের বেশ কিছু দল একসময় ইয়োরোপ আর মধ্য আমেরিকার উপকূলেও পাড়ি জমিয়েছিল। মানুষের অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে তারা এখন আশ্রয় নিয়েছে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অসংখ্য জনমানবহীন দ্বীপের আশপাশে।

ঈল কিংবা সীল'এর মত যেসব মাছ বা সামুদ্রিক প্রাণীরা এক গোলার্ধে থেকে অন্য গোলার্ধে পাড়ি জমায়—এদের চলার শক্তি আর পথের নির্দেশ দেয় কে? বিজ্ঞানীদের ধারণা—এইসব মাছেদের প্রধান পথপ্রদর্শক হ'ল মহাসাগরীয় স্রোত। এই স্রোতের টানেই ওই সব মাছের ঝাঁক এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সাঁতরে চলে। বছর কয়েক আগে একবার আমেরিকার উপকূলভাগ থেকে শুরু করে উত্তর অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরের আগাগোড়ায় অসংখ্য বোতল জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে শতকরা ৩০টিকে ফিরে পাওয়া যায় ফ্রান্সের এবং কয়েকটিকে বৃটেনের সমুদ্রোপকূলে। এর থেকে বিজ্ঞানীদের ধারণা—দেশান্তরী মাছেরা সামুদ্রিক স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম মুখো বাতাসের টানেও আমেরিকা থেকে ইয়োরোপে এসে পৌছতে পারে। ডিম পাড়ার ক্ষেত্রে অনেক সামুদ্রিক মাছই অবশ্য নোনা জলের চেয়ে মিষ্টি জল পছন্দ করে বেশী আর তা করে বলেই না সাগরের ইলিশ নদীনালার পথ ধরে এসে পৌছয় আমাদের দোরগোড়ায়!

(৫ পাতার পর)

অধ্যাপক উইলসনের গবেষণা পদার্থের দশা সম্বন্ধে নতুনভাবে আলোকপাত করেছে। তাঁর গাণিতিক মডেল এ সব সম্পর্কে অনেক আগাম তথ্য যোগাতে সাহায্য করে। চরমদশায় চৌম্বকক্ষেত্র, উত্তাপ শক্তি থেকে শুরু করে পৃষ্ঠটান এ সবের ভূমিকা কি সে সম্পর্কে নতুন ব্যাখ্যা জুগিয়েছে জি, উইলসনের গবেষিত তত্ত্ব।

অখণ্ড বলবিদ্যা বা কোয়ানটাম মেকানিকস-এর সাহায্যে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন বস্তু কিভাবে এক দশা থেকে আর এক দশায় রূপান্তরিত হয়।

তোমরা শুনে আনন্দ পাবে বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস—এর সাহায্যে জটিল ভৌত রাসায়নিক ক্রিয়া সহজতর হবে এবং সব থেকে বড় কথা—অধ্যাপক কেনেথ জি, উইলসনের এ অবদান বিদ্যুৎ পরিবহনের সময় অপচয় কমাতে সাহায্য করবে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে এবারের নোবেল পুরস্কার

এবারের চিকিৎসা বিজ্ঞান শাখায় নোবেল পুরস্কার ভাগাভাগি করে নিয়েছেন তিনজন বিজ্ঞানী—ডঃ সুন বার্গষ্ট্রম, ডঃ বেংট স্যামুয়েলসন এবং ডঃ জন ভেন। এঁদের কৃতিত্ব পেপটিক আলসার এবং মূত্রাশয়ের পাথুরী রোগের চিকিৎসায় এক নতুন ধরনের ওষুধ আবিষ্কার যার নাম 'প্রষ্টাগ্ল্যাণ্ডিন'। গত পনের বিশ বছরে এই প্রষ্টাগ্ল্যাণ্ডিন নিয়ে গবেষণা ভীষণভাবে বেড়ে গেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন উচ্চ রক্ত চাপ কমানো থেকে শুরু করে, গেঁটে বাত, হাঁপানি, রক্ত জমাট বাঁধা ঘটিত নানা অসুখ, খিঁচুনী, পেপটিক আলসার, গলব্লাডার বা মূত্রাশয়ের পাথুরী, চোখের গ্লকোমা এমন কি মায়েদের প্রসববেদনা শুরু করাতেও প্রষ্টাগ্ল্যাণ্ডিন আশাতীত সুফল দেখিয়েছে। আশার কথা, আমাদের দেশেও প্রষ্টাগ্ল্যাণ্ডিন নিয়ে নানা ধরনের কাজ হচ্ছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[৭৮৯৯ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকায় মানুষের বাস ছিল—তারপরেই ছ'ফুট লম্বা পিঁপড়েরা আন্দিজ পাহাড় থেকে বেড়িয়ে এসে এখানকার মানুষদের তাড়ায়। প্রথম আক্রমণ হয় ৭৭৫৭ সালে। ৭০ ডিগ্রি লঙ্গিটিউডের পশ্চিম ধারে দক্ষিণ আমেরিকার প্রধান শহরগুলো হঠাৎ একদিনে ধ্বসে পড়ে। বাকী সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকা প্রাণপণে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। পিঁপড়েদের শেষ আক্রমণের কথা জানা যায় সেনর সাবাটিনির লেখা থেকে—যাতে তার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিল অদ্ভুত এক সবুজ আলোর রশ্মি। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সেবারই মানুষের পাট ওঠে সুখময় সরকার একমাত্র মানুষ—যিনি পাঁচ বছর কাটান পিঁপড়েদের সঙ্গে। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ও একটি মাত্র সৈন্য তার নিজস্ব গবেষণাগারে গিয়ে লুকোন। চারদিন পর পিঁপড়েরা তাঁকে বন্দী করে। বন্দী অবস্থায় বিশেষ পদ্ধতিতে পিঁপড়েদের ভাষা শেখার সুযোগ হয় তাঁর। ভাষা শেখার ফলে তিনি পিঁপড়ের সমাজ-ব্যবস্থাটাও ভালভাবে বুঝতে পারেন। এমনভাবে দিন কাটছিল—হঠাৎ-ই সুখময়বাবুর সামনে আসে পালাবার সুযোগ !]

পিঁপড়েরা ব্যস্ত হতে জানে না—শুধু এই ভূমিকম্পেই তাদের যা বিচলিত হ'তে দেখেছি। এক-একদল ক'রে লিফ্‌টের মতো খাঁচায় ঢুকে আমরা ওপরে উঠে এলাম। অন্যান্য অনেকবার দেখেছি, ওপরে উঠতে-না-উঠতেই ভূমিকম্প থেমে যায়; কিন্তু এবারে ভূমিকম্প অত্যন্ত ভীষণ হয়ে উঠলো। আমাদের দল ওপরে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই সুড়ঙ্গ-পথটি ধ্বসে নিচে পড়ে গেল। চারিদিকে তখন ভীষণ বিশৃঙ্খলা: প্রতিমুহূর্তে পায়ের তলার মাটি ধ্বসে পড়তে পারে জেনে পিঁপড়েরা ব্যাকুল-ভাবে যেদিকে-সেদিকে ছুটতে শুরু করেছে। আমিও প্রাণভয়ে একদিকে ছুট্ দিলাম। ভূমি-কম্পের সঙ্গে-সঙ্গে আকাশে তখন ভয়ানক ঝড়ও উঠেছে। সেইসঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। খানিকদূর ছোটবার পর দেখলাম—চারিধারে কোথাও কোনো পিঁপড়ের দেখা নেই। এতদিন পিঁপড়েদের সঙ্গে বাস ক'রে তাদেরই সঙ্গী ও সহায় বলে ভাববার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল প্রথমটা সত্যিই অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলাম। ভূমিকম্পে তখন নানা জায়-গায় মাটি ফেটে আগুন ও ধোঁয়া বেরুতে আরম্ভ করেছে। পিঁপড়েদের ভাষায় চিৎকার ক'রে ডাকলাম। এই মানুষশূন্য-আমেরিকায় একমাত্র পরিচিত পিঁপড়েদের আশ্রয়চ্যুত হয়ে আমি কোথায়

যাবো! কিন্তু পরমুহূর্তেই একটি কথা হঠাৎ মনে হওয়ায় আমার কণ্ঠের ডাক আপনিই থেমে গেল। এই তো মুক্তির সুযোগ! পিঁপড়েরা হাজার ভালো ব্যবহার করলেও চিরদিন আমায় নজরবন্দী ক'রে রাখবে, কোনোদিন মানুষের মাঝে ফিরতে দেবে না। আমি যে তাদের অনেক কথা জানি। হয় মৃত্যু, নয় মুক্তির এই তো সুযোগ! পিঁপড়েদের দেখা পাওয়া নয়, কোনো রকমে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়াই হলো আমার উদ্দেশ্য, প্রাণপণে তাই ছুটতে লাগলাম।

"ভূমিকম্প যখন থামলো, পিঁপড়েদের ঘাঁটি থেকে তখন আমি অনেক দূর এসে পড়েছি। এই-বার আমার খোঁজ পড়বে, জেনে ক্লান্তপদেও আরো এগিয়ে চলতে লাগলাম। আমার একমাত্র মুক্তির উপায় সমুদ্র-তীরে পৌঁছে কোনোরকমে ভেলা তৈরি ক'রে সমুদ্রে ভাসা। সে-সমুদ্রে যদি মৃত্যুও হয়, তবুও ভালো, তবু তো আকাশের তলায় ফাঁকা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে মরতে পারবো।

"কেমন ক'রে সমুদ্রতীরে পৌঁছে ভেলা তৈরি ক'রে ভেসে পড়েছিলাম ও কেমন ক'রে আমার উদ্ধার হয়, তার কথা সব সংবাদপত্রেই বেরিয়েছে; সুতরাং তার পুনরাবৃত্তি ক'রে কাহিনী বাড়াবো না।

"পরিশেষে বলতে চাই যে, মানুষ আবার দক্ষিণ-আমেরিকা অধিকার করবার আয়োজন করছে—কিন্তু আমার সে-আয়োজনের প্রতি আর আস্থা নেই। দক্ষিণ-আমেরিকা অধিকার করা তো দূরের কথা, মানুষের বর্তমান অধিকারগুলি এই দুর্ধর্ষ কীটেদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করাই একদিন আমাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে বলে আমার বিশ্বাস। পিঁপড়েদের আমি যে-রকম ক'রে জানবার সুযোগ পেয়েছি, তাতে এরকম বিশ্বাস আমার সহজেই জন্মেছে।"

(সমাপ্ত)

শেষ হতেই বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

নিছকই একটা সস্তা ফ্যান্টাসী! সমুদ্রের নীচে এক ধরণের কাল্পনিক প্রাণীদের নিয়ে লেখা গল্প। তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি নাকি মানুষের চেয়েও বেশী। যুক্তিটা এইরকম যে, বিবর্তন বা ইভলিউশন কেবল স্থলচরদেরই হয়নি, জলচরদেরও হয়েছে—এবং জলচরের আবির্ভাব যেহেতু অনেক আগে, বুদ্ধির বিবর্তনেও তারা মানুষের চেয়ে এগিয়ে গেছে।

ট্র্যাশ বই! ত্রিঙ্কোমালি বন্দরে এসে আমার মত একটা ইণ্টারন্যাশনাল স্পাই এই বই পড়ে সময় নষ্ট করছে—কথাটা ভাবতে আমার নিজেরই হাসি পেল।

ব্যাপারটা একটু খুলেই বলা যাক। বিখ্যাত এক আমেরিকান পত্রিকার বিজ্ঞান-সাংবাদিক সেজে আমাকে যে এখানে আসতে হয়েছে তার কারণ এখানকার সদ্য-সমাপ্ত এক বিশাল হাইড্রোথার্মাল প্রজেক্ট। এই প্রকল্প যদি সফল হয় তাহলে ভারতবর্ষ একাই পৃথিবীর অন্তত অর্ধেক বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে পারবে। আসলে বিশ শতকের শেষের দিকে সারা পৃথিবী জুড়ে যখন বিদ্যুৎসঙ্কট দেখা দেয় তখন থেকেই সমুদ্রের জলের তাপশক্তিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগাবার কথা অনেকের মাথায় আসে। মূল সূত্রটাকে খুব জটিলও বলা যায় না। সমুদ্রের নীচে মাত্র মাইলখানেক গেলেই দেখা যাবে সেখানকার জল বরফের মত ঠাণ্ডা। যেখানে অজস্র অফুরন্ত জলের ভাণ্ডার সেখানে ওপরের সঙ্গে নীচের তলের এই উষ্ণতার তফাৎ মানেই এক দানবিক শক্তির উৎস। অথচ, এই সরল

সূত্রটিকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা আজ পর্যন্ত সফল হয়নি। ভারতীয় প্রযুক্তিবিদরাই প্রথম এই বিরাট ব্যাপারটি সম্ভব করতে চলেছেন। আর কয়েক মিনিট পরেই এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যাবে। ত্রিঙ্কোমালি বন্দরে এই দানবীয় 'হাইড্রোথার্মাল প্রজেক্ট' পরীক্ষামূলক ভাবে চালু করা হবে আজকেই রাত একটার সময়। গোপন খবর! স্কুপ নিউজ! —সুতরাং একেবারে সকালবেলায় এসে হাজির হয়েছি আমার সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে—এমনকি দশ ইঞ্চি লোহার পাতে মোড়া জলযানটি পর্যন্ত। রাত একটায় যদি এটা চালু হয়, অন্তত তিনঘণ্টা বন্দরের ওপরটা সরগরম হয়ে থাকবে। সেই সুযোগে আমি জলে নেমে পড়তে পারবো। কারণ—

এই বিরাট প্রকল্পের আসল রহস্য যে স্থলভাগে নেই সেটা জানার জন্যে আমাকে খুব বেশীদিন পরিশ্রম করতে হয়নি। আমি জানতে পেরেছি, রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে একটা গ্রিড, অর্থাৎ বিদ্যুৎ-বাহী তারের কুণ্ডলীর মধ্যে—যেটা ত্রিঙ্কোমালির নিমজ্জিত পাহাড়ের একেবারে নীচে সমুদ্রের তিন হাজার ফুট গভীরে অত্যন্ত সুরক্ষিত আবরণের মধ্যে রয়েছে। আর সেটাই আসলে আমার দরকার, কারণ—

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। অটোমেটিক ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল। একটা বাজতে আর চার সেকেণ্ড বাকি।

তিন—দুই—এক—

অকস্মাৎ এক বিশাল শব্দ চারিদিক আলোড়িত করে তুলল।

অদ্ভুত! অবিশ্বাস্য! ভারতীয় প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। প্রজেক্ট সঠিক সময়ে কাজ শুরু করেছে।

কিন্তু একি!

মিনিট কয়েকের মধ্যে আমাকে বিমূঢ় করে শব্দটা হঠাতই যেন একটা ধাক্কা দিয়ে থেমে গেল।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর দীপ্ত চৌধুরীর চেম্বারে বিরাট জটলা। সেটা ভেদ করে তাঁর কাছে পৌঁছে নিজের পরিচয়পত্র দেখালাম। বললাম, 'কি ব্যাপার?'

দীপ্ত চৌধুরী একটু সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন, আমি বললাম, 'আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। আমি আপনার শত্রু নই।'

'তাহলে আগে সাংবাদিকদের ঠেকান। এ ব্যাপারে এখুনি যেন ওরা কোন সিদ্ধান্ত না নেয়।'

'সেটা আমার ওপরই ছেড়ে দিন না। কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

'বলা শক্ত, আমাদের চিফ ইঞ্জিনীয়ার এটা চালু করে দিয়েই সুপারজেট ধরে মানালিতে বিশ্রাম নিতে গেছেন—চার ঘণ্টার আগে তাকে পাবোনা।'

'আপনি নিজে কিছু বুঝতে পারছেন না?'

'কিছুই না। এটা চালু করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন আমাদের হিসেবমতোই চলছিল। হঠাৎ ভোল্টেজ খুব ফ্লাকচুয়েট করতে শুরু করলো। তাড়াতাড়ি লোড কমিয়ে দিলাম কিন্তু কিছু বুঝবার আগেই মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ওপ্‌ন্ সার্কিট হয়ে গেল—মানে, সব চুপচাপ।'

'আপনার চেকিং স্টাফ কিছু ধরতে পারেনি?'

'ওপরে তো সব কিছু ঠিক আছে। গণ্ডগোল যদি কিছু হয়ে থাকে, তা সমুদ্রের মধ্যে।

'অর্থাৎ গ্রিডে'—কথাটা বলতেই দীপ্ত চৌধুরী ভুরু কুঁচকে তাকালেন আমার দিকে। তাঁকে একে-

বারে আমল না দিয়ে বললাম, 'কিন্তু কোন কেব্‌ল্ ছিঁড়েও তো গ্রিডের সঙ্গে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে ?'

'কি করে ছিঁড়বে ! কোন বড় জাহাজ এদিকে আসেনি। তিমি টিমি জাতীয় কোন জীবেরও সন্ধান নেই—তাহলে ?'

'ভূমিকম্পের ব্যাপারটা চেক করেছেন ?'

'নিশ্চয়ই। সিসমোগ্রাফে কিছুই পাওয়া যায়নি।'

একটু থেমে বললাম, 'মিস্টার চৌধুরী, এটা বুঝতে পারছি যে, তিন হাজার ফুট গভীরে যে গ্রিড আছে তা পরীক্ষা করার মত লোক আপাতত আপনার নেই। এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করিতে পারি, উপযুক্ত সরঞ্জামও আমার আছে। কিন্তু অনুগ্রহ করে প্রশ্ন করবেন না, আমি কেন এসব সঙ্গে নিয়ে এসেছি।'

দীপ্ত চৌধুরীর কপালে ভাঁজ পড়ল, বললেন—'ব্যাপারটা গোপন থাকবে তো ?'

'নিশ্চয়ই !'

'আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারবো ?'

আমি হেসে বললাম, 'আনন্দের সঙ্গে।'

আধঘণ্টার মধ্যেই আমার জলযান তৈরী। সুতীব্র আলো পড়ে জলের ওপরটা এই মধ্যরাত্রেও রূপোর পাতের মত চকচক করছে। সঠিক হিসেব মত এসে দাঁড়ালাম গ্রিডের ঠিক ওপরে। আগেই নীচে নামার দরকার নেই—গ্রিডের সঠিক অবস্থাটা প্রথমে জানা দরকার। সেজন্য টিভি ক্যামেরাগুলোই যথেষ্ট। পোজিশন ঠিক করে কেব্‌লের সাহায্যে কয়েকটা স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা নামিয়ে দিলাম জলের নীচে।

সোনার স্ক্রীনে চমৎকার ছবি পাচ্ছি। জল অত্যন্ত পরিষ্কার, কোথাও কিচ্ছু নেই। জল যত গভীর হচ্ছে, দু'একটি অদ্ভুত আকৃতির মাছ দেখা যাচ্ছে। এবার পাওয়ার কেব্‌ল্‌গুলো দেখতে পাচ্ছি—পাহাড়ের গায়ে দৃঢ়ভাবে ঢোকানো শক্ত খোঁটার সঙ্গে সেগুলি অক্ষত অবস্থায় আটকানো। কিন্তু একি, গ্রিডের খাঁচার একি চেহারা !

দীপ্ত চৌধুরীর মুখের দিকে তাকালাম। অবিশ্বাস্য এক চাউনি তাঁর চোখে। সত্যিই অবিশ্বাস্য ! সমস্ত খাঁচাটা একেবারে বিধ্বস্ত ! সেই ভাঙা খাঁচার মধ্যে গ্রিডের কোন অস্তিত্বই নেই।

দীপ্ত চৌধুরী ফিস ফিস করে উঠলেন—'অসম্ভব ! এই খাঁচা ভাঙার জন্যে যে দানবীয় শক্তির প্রয়োজন—পৃথিবীর কোন প্রাণীরই তা থাকতে পারে না।'

'কিন্তু এটা কোন দুর্ঘটনাও নয়' আমি বললাম, 'গ্রিডটা ওখানে থেকে সরিয়ে নেওয়াই যে খাঁচা ভাঙার উদ্দেশ্য, তা অত্যন্ত পরিষ্কার।'

'কি করে তা সম্ভব ! আমাদের নেভী সব সময় কড়া পাহারায় রয়েছে।' 'ঈশ্বর করুন এটা যেন দুর্ঘটনাই হয়'—আমি বললাম, 'তাহলে ওখানে গেলেই গ্রিডটা খুঁজে পাওয়া যাবে। আমি নীচে যাচ্ছি—আপনি কি আমাকে রিপ্লেস করার জন্য আর একটা গ্রিড দেবেন ?'

দু'এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন দীপ্ত চৌধুরী, তারপর বললেন, 'মাপ করবেন সেটা আমার দেবার অধিকার নেই।'

চালাক লোক ! গ্রিডটা সরাবার মতলব কাজে লাগলোনা দেখছি। বললাম—ঠিক আছে ! আপনি আমার সঙ্গে নীচে যাবেন তো ?

'না। আপনি একাই যেতে পারেন। রিমোট-কণ্ট্রোলারে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।'

খাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁষে খাঁচার কাছে পৌঁছতে আমার বেশী সময় লাগলো না। গ্রিডটা খুঁজে পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই—তবু আমি চারদিকের অবস্থাটা বুঝে নেওয়ার জন্য হাইড্রোভিশনের পর্দায় চোখ রাখলাম।

সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল আমার! একটা অস্পষ্ট আলোর আভা এদিকে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু বিপদে পড়লে আমার বুদ্ধি বেড়ে যায়। আলোটা নিভিয়ে দিলাম। নিজের উপস্থিতি কাউকে জানিয়ে কাজ নেই। এতে অবশ্য হাইড্রোভিশনও বন্ধ হয়ে গেল।

আলোর আভা এখন খালি চোখেও দেখতে পাচ্ছি। ক্রমশ তা উজ্জ্বলতর হচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে বোঝা গেল তা একটি আলো নয়, অসংখ্য ছোট ছোট আলোর বিন্দু—যেন এক বিরাট বাহিনী এগিয়ে আসছে। এরপর যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

আলোর যে অজস্র বিন্দু আমি দেখছি তা বিচ্ছুরিত হচ্ছে অদ্ভুত কিছু সামুদ্রিক জীবের গা থেকে। বিচিত্র বর্ণের সব আলো—এত রকমের আলো যে হতে পারে, তাই আমার জানা ছিল না। সেগুলো আবার প্রতি মুহূর্তে রং পরিবর্তন করছে। প্রতিটি পরিবর্তন যেন এক বিশেষ নক্শা তৈরী করছে। সমুদ্রের অতল গভীরে নিকষ কালো জলের মধ্যে এ যে কি অপরূপ সৌন্দর্য—চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

অকস্মাৎ আমার মাথায় যেন বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল। না, কোন ভুল নেই—নক্সার মধ্যে মুহূর্তের জন্য পর পর ঝলসে উঠল আমার এই জলযানের চেহারা, আমার চেহারা, গ্রিডহীন খাঁচাখানা। তাহলে কি—

হ্যাঁ, এদের ভাষা আছে। আলোর পরিবর্তন, নক্শার পরিবর্তন—এদের ভাবপ্রকাশের মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিকল্পিত উপায়ে এরা নিজেদের মধ্যে নিজের ভাষায় কথা বলছে।

মুহূর্তের চিন্তা, তারপরেই আলো জ্বেলে দিলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে তারা জল তোলপাড় করে মিলিয়ে গেল। কয়েকটা বয়েন্সি ট্যাংকের সুইচ অন করতেই আমার জলযান মিনিট কয়েকের মধ্যে ওপরে উঠে এল।

'কি ব্যাপার, এত দেরী? বললেন দীপ্ত চৌধুরী'

'পেলেন খুঁজে?'

'না'।

'তাহলে'?

'ব্যাপারটা দুর্ঘটনা নয় এই পর্যন্ত বলতে পারি। না, কোন মানুষের হাত এতে পড়েনি। তাহলে কে, সে প্রশ্ন আমাকে করবেন না—উত্তরটা এতো হাস্যকর হয়ে যাবে, আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। যদি পারেন গ্রিড বদলাবার পর ওখানে তীব্র আলোর ব্যবস্থা করবেন।'

নিজের ঘরে ফিরে এলাম। আমার চোখ জ্বালা করছিল। চেতনার গভীরে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, সমুদ্রের সেই বুদ্ধিমান প্রাণীরা গ্রিড খুলে নিয়ে পরীক্ষা করছে, তার রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করছে। বুদ্ধিতে মানুষের চেয়ে ছোট নয়—সে প্রমাণ আমি পেয়েছি। গ্রিডটা সংগ্রহ করতে পারলাম না, আমার পক্ষে নিঃসন্দেহে সেটা দুঃখের বিষয়। কিন্তু আমার আসল দুঃখটা আরও বড়। আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি আমাদের সাফল্যের দিন শেষ হয়ে এসেছে—আমার নয়, সমস্ত মানুষের!

———

ধারাবাহিক সায়েন্স ফিকশন

গ্রীন থামব

ক্লিফোর্ড সিম্যাক

অফিস থেকে বাড়ী ফিরে যেই আমি জান্‌লার দিকে মুখ করে টেবিলের উপর পা তুলে বসি, অমনি আমার চোখে পড়ে আমাদের পাড়ার সেই নচ্ছার কুকুরটার কাণ্ডকারখানা। জান্‌লার সামনে রাখা ডাস্টবিন্‌টার ময়লা আবর্জনাগুলোকে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে কুকুরটা যে কি আনন্দ পায়! ডাস্টবিনের ঢাক্‌নাটার উপর কতদিন যে থানইট চাপা দিয়েছি, কতদিন পাথর ছুঁড়ে মেরেছি ঐ কুকুরটাকে! জঞ্জাল ঘাঁটার নেশা কিন্তু ওর ছোটে নি।

সেদিনটার কথা মনে পড়ে। সক্কালবেলায় বুড়ো পিট্‌-এর গলা পেলাম।

একবার আমার এখানে আসতে পারো? ফোন ধরতেই পিট্‌ সরাসরি প্রশ্ন করে আমাকে।

আসছি। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

আমার বাগানের উত্তর দিকের অনেকটা জায়গা থেকে কারা যেন অনেকখানি মাটি খুবলে নিয়ে গেছে। আর তার বদলে ঐ বিশাল গর্তের পাশে পড়ে রয়েছে খানিকটা ঝুর্‌ঝুরে বালি!

পিট্‌-এর কথায় আমারও কেমন ধাঁধাঁ লাগে। ওর বাগানে লোকে গর্ত খুঁড়তে যাবে কেন? তাছাড়া ওর জমির কাদামাটির পাশে বালির ঢিপিই বা আসে কোত্থেকে?

ফোন নামিয়ে আমি পিট্‌-এর বাড়ীর দিকে রওনা দিই। আমাদের ছোটখাট শহরটাকে মফঃস্বলই বলা যায়। এখানকার বাসিন্দাদের প্রায় সবাই সবাইকে চেনে। পিট্‌-এর মত অনেকেই আবার আমার উপর একটু বাড়তি ভরসা করে। আমি নাকি নানাজনের নানা সমস্যার সমাধান করতে পারি!

বাগানেই দাড়িয়ে ছিল পিট্‌। সঙ্গে ছিল জনাক'য়েক পাড়াপড়শী। বিশাল এক গর্তের সামনে দাড়িয়ে ওরা ভীষণ উত্তেজিতভাবে কিছু বলাবলি করছিল।

গোলাকার গর্তটার দিকে ভাল করে তাকালাম। ব্যাস হবে আন্দাজ তিরিশ ফুট; আর গভীরতাও পঁয়ত্রিশ ফুটের কম নয়। এমন সুন্দরভাবে চার-পাশের মাটি কাটা হয়েছে যে গর্তটা একেবারে নিখুঁত শঙ্কুর আকৃতি নিয়েছে। কোদাল-বেল্‌চা দিয়ে এমনভাবে মাটি কাটা যায় না; নির্ঘাৎ অদ্ভুত কোনও মেসিনের কাজ। গর্ত থেকে একটু দূরেই সাদা বালির স্তূপ। আমার কেন জানি না মনে হ'ল, ঐ বালিগুলোকে গর্তের মধ্যে ঢেলে দিলেই গর্তটা কানায় কানায় ভর্তি হয়ে যাবে। আশেপাশে অনেক দূর পর্যন্ত কোথাও কোনও গাড়ী কিংবা ট্রাকের চাকার দাগ চোখে পড়ল না।

আমার হঠাৎ মনে হ'ল, এখানকার মাটি পরীক্ষা করানোর দরকার হতে পারে। এটা মনে হতেই আর দেরী করলাম না। পিট্‌-এর বাড়ী থেকে দু'খানা কৌটো যোগাড় করে তার একটাতে ঐ গর্তের মাটি আর অন্যটাতে বালির ঢিপি থেকে খানিকটা বালি ঝট্‌পট্‌ পুরে ফেললাম।

বাড়ী ফিরেই শুনলাম, ব্যাঙ্ক-মালিক স্টিভেন্‌স্ ফোন করেছিলেন। সময়মত আমাকে একবার ওঁর বাড়ীতে যেতে বলেছেন। ভদ্রলোকের এক বিরাট বাগান আছে জানতাম। শুনেছিলাম, নানা জাতের দেশী বিদেশী ফুল ফোটানোই ওঁর একমাত্র নেশা। নিশ্চয়ই ঐ বাগানের ব্যাপারেই আমার সাহায্য দরকার। ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক টাকা-পয়সার ব্যাপারটা যে আমি তেমন বুঝি না তাতো উনি জানেন।

আমার ধারণাটা যে এক্কেবারে ঠিক তার প্রমাণ পেলাম খানিকক্ষণ পরেই। মাটি পরীক্ষার জন্য শহরের নির্দিষ্ট ল্যাবরেটরীতে পিট্-এর বাগানের মাটি আর বালির নমুনাটা পৌঁছে দিয়ে স্টিভেন্‌সের সঙ্গে দেখা করতেই তিনি হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন। বললেন, আমার বাড়ীর পেছনের বাগানটায় একবার চলুন। কত চেষ্টায় বিশেষ জাতের ফুলের বীজ যোগাড় করে তা থেকে গাছ বানিয়েছি! কে আমার এমন সর্বনাশ করল?

অতঃপর স্টিভেন্‌সের সঙ্গে ওঁর সাধের বাগানে এসেছি এবং যে দৃশ্য দেখেছি যা আমার কাছেও যথেষ্ট মর্মান্তিক ঠেকেছে। অতবড় বাহারী বাগান-টায় একটাও জ্যান্ত গাছ চোখে পড়ে নি। কে যেন এক নিমেষে সব বাগানের যাবতীয় গাছকে নিঃশেষ করে দিয়েছে!

স্টিভেন্‌স্-এর কোন শত্রু বিষাক্ত ওষুধ ছিটিয়ে গাছগুলো নষ্ট করে দিয়েছে কিনা ভাবতে ভাবতে মরা ফুলগুলোর দিকে ভাল করে একটু নজর দিতে গিয়েই গর্তগুলো চোখে পড়ল। অগুন্তি ছোট-খাট গর্ত ছড়িয়ে রয়েছে সারা বাগান জুড়ে! সাধারণতঃ জমি থেকে আগাছা টেনে তোলার পর যে ধরনের গর্ত থেকে যায় ঠিক তেমনিই লাগছিল ওগুলোকে।

এরমধ্যে কি বাগান থেকে আগাছা তুলেছেন? স্টিভেন্‌স্‌কে জিজ্ঞাসা করি।

তাতো তুলেছি। সব সময়ই তুলি। স্টিভেন্‌স্ উত্তর দেয়। ফুলগাছদের বাঁচিয়ে রাখতে হলে আগাছা তো তুলতেই হয়। তবে কথা হ'ল কি জানেন, আমার বাগানের সাধারণ আগাছাগুলোকে উপড়ে আনলে জমিতে যতটুকু গর্ত থেকে যায়—এই গর্তগুলো তার তুলনায় অনেক বড়! রহস্যটা তো ওখানেই।

বলাবাহুল্য, প্রায় আধঘণ্টাটাক অপেক্ষা করার পরও রহস্যভেদের কোন সূত্র খুঁজে না পেয়ে আগের বারের মতই স্টিভেন্‌স্-এর বাড়ী থেকেও একটা টিনের কৌটো জোগাড় করেছি এবং যথারীতি তার মধ্যে স্টিভেন্‌স্-এর বাগানের মাটি খানিকটা পুরে রওনা দিয়েছি বাড়ীর দিকে।···

বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই টের পেলাম—রাস্তার কুকুরগুলো বড় একটা ঝোপের সামনে জড়ো হয়ে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। নির্ঘাৎ ঝোপের মধ্যে বেড়াল ঢুকেছে—ভাবতে ভাবতে ঝোপের দিকে এগিয়ে যাই এবং কুকুরগুলোও বোধহয় আমাকে দেখেই এক এক করে কেটে পড়ে। ঝোপের মধ্যে বেড়ালটাকে খুঁজতে গিয়েই সেই অদ্ভুত জিনিষটা চোখে পড়ে।

জিনিষটাকে আগাছা বলাই ভাল; যদিও তার উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট এবং সত্যি বললে, আমার চেনা তো নয়ই—এমন অদ্ভুত শিকড়-ওয়ালা আগাছা যে পৃথিবীতে থাকতে পারে সেটাই আমার ধারনায় ছিল না। আগাছাটার গোড়ার দিকটা মানুষের কব্জির মত মোটা; আগাছার মাঝামাঝি

অংশ গোটা চারেক শাখা বেরিয়েছে আর একদম আগায় অদ্ভুত ধরনের কয়েকটা ফুল ফুটে আছে—তেমন ফুল আমি জন্মে দেখি নি।

দিনের আলোয় ভালো করে দেখব বলে আগাছাটাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম বাড়ীতে—রেখে দিলাম লনের একপাশে। বাড়ীতে আমি একা থাকি, রান্নাবান্না নিজেকেই করতে হয়। খাওয়া দাওয়া শেষ করে বিছানায় শুয়েই মনে হল—আগাছাটাকে লনের মধ্যে ফেলে না রেখে ঘরে নিয়ে আসি। বাইরের বারান্দার আলো জ্বেলে ঘরের বাইরে বেরতেই চমকে উঠলাম। আগাছাটাকে যেখানে রেখেছিলাম সেখান থেকে ওটা সরে গেছে লনের অন্য কোনে এবং ডালপালা দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে লনের পাঁচিল। ঠিক মানুষের মত সোজা হয়ে দাড়িয়েছে ওটা—যেন এক্ষুনি পাঁচিল ডিঙোবে! সেই মুহূর্তে আমি ভীষণ ভয় পেলাম এবং কেন জানি না—বারান্দার ধারে রাখা কুড়ুলটাকে তুলে নিলাম হাতে। হয়ত ভেবেছিলাম, আগাছটা যদি পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে যেতে চায় তবে কুড়ুল দিয়ে টুকরো টুকরো করব ওটাকে। কয়েক মিনিট কাটল, তারপর দেখি আগাছাটা আস্তে আস্তে পিছু হটছে। কি যে মনের মধ্যে হয়ে গেল আমার! ঠক্ করে কুড়ুলটা মেঝের উপর নামিয়ে রেখে বাগানে জল দেওয়ার বালতি করে খানিকটা জল এনে তার মধ্যে আগাছার মূলগুলো ডুবিয়ে দিলাম। ঐ অবস্থায় আগাছটাকে ফেলে রেখে ঘরের মধ্যে ফিরে মনে হ'ল—জল ছাড়া তো অন্য কোনও খাবার ওকে দেওয়া হ'ল না। সঙ্গে সঙ্গে বাগান থেকে খানিকটা মাটি তুলে ফেলে দিলাম বালতিটার মধ্যে। রাত্রে তো সূর্যের আলো পাবার সম্ভাবনা নেই, অতএব গাছটার পাশেই ইলেকট্রিকের জোরালো আলো রাখলাম একটা।

গাছের বেঁচে থাকার জন্য যা যা দরকার তার সবই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুতে গিয়ে, যেই আগাছাটার কথা ভেবেছি—অমনি আমার শরীরের মধ্যে কেমন যেন একটা শিহরণ বয়ে গেল। হঠাৎ আমার মনে হল—আমাদের পৃথিবীতে ঐ আগাছায় জন্ম হতেই পারে না। আমরা পৃথিবীর মানুষ যে গাছেদের চিনি তারা কি কখনও মাটির উপর চলে ফিরে বেড়াতে পারে? কাউকে বললে সে হয়ত সত্যি সত্যি হোঃ হোঃ করে হেসে উঠবে, আমার কিন্তু নিশ্চিতভাবে মনে হ'ল—ওটা নিশ্চয়ই অন্য কোনও গ্রহ থেকে আসা বুদ্ধিমান জীব।

কিন্তু পৃথিবীতে ওটা এল কিভাবে? আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল পিট-এর বাগানের সেই বিরাট খাদ আর স্টিভেন্স্এর বাগানের অগুন্তি গর্তগুলোর কথা। ওগুলোর সঙ্গে কি এই আগাছার সম্পর্ক থাকতে পারে? ব্যাপারটা জানতে হবে এবং এক্ষুনি। স্টিভেন্স্এর বাড়ী আমার বাড়ী থেকে বেশী দূরে নয়। আমার ফ্ল্যাশ্ লাইটটা নিয়ে স্টিভেন্স্-এর বাগানে গিয়ে গর্তগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। লক্ষ করলাম ওখানে রয়েছে ঠিক আট-সারি গর্ত—প্রত্যেক সারিতে আবার গর্তের সংখ্যা চার। আমার এবার বুঝতে কষ্ট হ'ল না—আমার বাগানের অতিথিটিকে এই রকম একটা সারিতে রেখে দিলে এবং সেও তার শরীরের চারটে প্রশাখার সাহায্যে মাটি আঁকড়ে ধরলে ঠিক ঐ রকমই চারটে গর্ত হ'ত।

আগাছাটা তাহলে একা আসে নি, অন্ততঃ গোটা সাতেক সঙ্গী নিয়ে এই বাগানে ঢুকেছিল। স্টিভেন্স্ হঠাৎ মাঝরাতিরে ঘুম ভেঙে উঠে আমাকে ওর বাগানে দেখলে অবাক হবে নিশ্চয়ই। তবুও আমি ফ্ল্যাশ লাইটের জোরালো আলোয় পুরো বাগানটায় তন্ন তন্ন করে ওদের খোঁজ করলাম—অবশ্য একটারও দেখা মিলল না।

কোথায় গেল ওরা? (চলবে)

অনুবাদ : সুতপা চক্রবর্তী

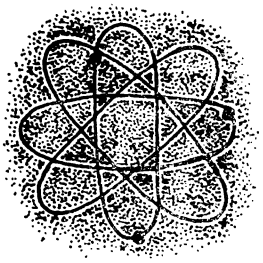

পরমাণু-শক্তির গল্প

লরা ফের্মি

(পরমাণুকে ভাঙ্গা যায় না, কিন্তু·····)

[বিশ্ববিশ্রুত পরমাণু বিজ্ঞানী এনরিকো ফের্মির নাম আমরা প্রায় সকলেই জানি। লেখিকা লরা ফের্মি হলেন তাঁরই স্ত্রী। স্বামীর সূত্রে ত বটেই, তিনি তাঁর নিজের যোগ্যতাতেও পৃথিবীর বহু নামকরা বিজ্ঞানীর সংস্পর্শে আসেন এবং পরমাণু বিজ্ঞানের গবেষণা ও তার অগ্রগতির কাজে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন।

এনরিকোর মৃত্যুর পর ল। ১৯৫৫ সালে পরমাণু-শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের উপর প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনে আমেরিকার ভূমিকার কথা তিনি 'Atoms for the world'-বইয়ে লিখে রাখেন। তাঁর 'Atoms in the family' বইটি খুব সুন্দর। একালের একজন শ্রেষ্ঠবিজ্ঞানীর স্ত্রী হিসাবে তাঁর জীবনের অনেক মজার মজার কথা এতে আছে।

লরার আরও একটি বইয়ের নাম 'The story of Atomic Energy'। এর প্রথম অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ এখানে প্রকাশ করা হল। পরবর্তী অংশগুলি একে একে প্রকাশ করা হবে। এই লেখায় পরমাণুর রহস্য ও মানুষ তা জানল কী ভাবে তাই জানা যাবে।]

আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের কথা নিয়েই আমার এই গল্প লেখা। পদার্থের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলিকে (আমরা যাদের পরমাণু বলি) জানার জন্য মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কী চেষ্টাই না করেছে! পরমাণু কীভাবে তৈরী হল, তাদের কাজই বা কী সেসব কথা তারা আস্তে আস্তে জেনেছে। আমার এই গল্পে মানুষের নিরন্তর প্রয়াসের কথা যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে পরমাণু-শক্তি সম্পর্কে মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কিছু ভাবনার কথা।

আজ আমরা জানি, পরমাণু হল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণা যা দিয়ে সমস্ত পদার্থ তৈরি। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই পরমাণুর কথা কে প্রথম ভেবেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। পুরানো ভাবনা-চিন্তার উপর নতুন ভাবনা-চিন্তা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। পৃথিবীতে যতদিন চিন্তা-ভাবনা করার মত মানুষ থাকবেন, ততদিন তাঁরা আশেপাশের নানা ব্যাপার নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রশ্ন তুলবেন। অনেকে অবশ্যই ভেবেছেন, "সূর্য, চন্দ্র, পাহাড়, সমুদ্র, নক্ষত্র, পশু-পাখি, বন-জঙ্গল, আরও কত কী আমরা প্রাকৃতিতে দেখতে পাই, আমরা জিনিস তৈরিও করতে পারি। এসব দেখতে আলাদা হলেও, এগুলো কি কতকগুলো মৌল দিয়ে তৈরী?" এর উত্তরে কতজন ভেবেছিলেন যে, সমস্ত পদার্থই হয়ত কত ছোট ছোট কণিকা দিয়ে তৈরি তা আমরা জানি না।

অনেক, অনেক বছর আগে কোন কোন দার্শনিক অবশ্য এরকম ভাবতেন। এঁদের একজন হলেন ডেমোক্রিটাস। গ্রীসে প্রায় ২৪০০ বছর আগে তিনি বাস করতেন। ডেমোক্রিটাসের কিছু লেখা আমাদের হাতে এসেছে বলে আমরা তাঁর কথা

কিছুটা জানতে পেরেছি। এমন অনেকে থাকতে পারেন যাঁদের ধারনা ঐ রকমই ছিল, কিন্তু তাঁদের কোন লেখা, পুঁথিপত্র আমরা পাই নি বলে তাঁদের কথা আমরা জানতেও পারি নি। ডেমোক্রিটাস বলতেন প্রত্যেকটি জিনিসই খুব ছোট ছোট কণা দিয়ে তৈরি, এবং সেগুলি এতই ছোট যে তাদের চোখে দেখা যায় না। সেই ক্ষুদ্র কণাগুলি নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন রকমে জোট বেঁধে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে। এই কণাগুলির কোন পরিবর্তন হয় না, এবং তাদের আরও ছোট অংশে ভাগ করা যায় না। গ্রীক শব্দ 'অ্যাটোমস'-এর অর্থ হল 'যাকে ভাঙা যায় না'। ডেমোক্রিটাস সেই অর্থেই এই ক্ষুদ্র কণিকাগুলির নাম দিয়ে ছিলেন 'অ্যাটস্‌ম'। তাঁর মতে 'অ্যাটম্‌স্' বা পরমাণু হল, পদার্থের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ এবং তার অস্তিত্ব আছে।

ডেমোক্রিটাসের যুক্তিটা ছিল এই রকম:— জলের কথাই ধরি, আমরা এক ফোঁটা জলকে দু ফোঁটায় ভাগ করতে পারি। সে রকম যন্ত্রপাতি থাকলে তাকে হয়ত আরও ছোট ছোট ফোঁটায় ভাগ করা যায়। কিন্তু এভাবে কি একের পর এক অবিরাম ভাবে ভাগ করে যাওয়া সম্ভব?

ডেমোক্রিটাসের এই ধারনার কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না। তাই তিনি এর কোন প্রমাণও দিতে পারেন নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটেছে, খুব কম লোকই পরমাণুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছে। বেশীর ভাগ মানুষই মনে করেন পরমাণু হল ডেমোক্রিটাসের কল্পনামাত্র। কিন্তু গত সাড়ে তিনিশ বছরে আধুনিক বিজ্ঞান যতই এগিয়েছে পদার্থ বিজ্ঞানী ও রসায়ন বিজ্ঞানীরা ততই ডেমোক্রিটাসের ধারণার কাছাকাছি হয়েছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গ্যালিলিও বললেন, "কিছু কিছু জিনিস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ হয়ে যায় একথা ধরে নিয়ে আমি স্বাদ ও গন্ধের ব্যাখ্যা দিতে পারি।" তিনি বললেন, এই ক্ষুদ্র কণাগুলিই জিভ ও নাকের ভিতর বিশেষ বিশেষ জায়গায় আঘাত করে আমাদের স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতি জাগায়। পরবর্তী কালে দেখা গেছে যে গ্যালিলিওর কথাই ঠিক।

ঐ শতাব্দীরই শেষদিকে ইংরেজ রসায়নবিদ রবার্ট বয়েল বলেছেন, বাতাস এবং অন্যান্য সমস্ত গ্যাসই যেভাবে কাজ করে তাতে মনে হয় সেগুলি এরকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা বা পরমাণু দিয়েই তৈরি। পরমাণু আছে এটা ধরে নিয়ে তখন একের পর এক বহু ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু হল।

(খ)

ইংরেজ বিজ্ঞানী জন ড্যালটনই প্রথম একটি বিজ্ঞান সম্মত পরমাণু-তত্ত্ব দেন। ১৭৬৬ সালে ইংলণ্ডের একটি ছোট্ট গ্রামে ড্যালটনের জন্ম হয়। ছেলেবেলায় গ্রামের একটি ছোট স্কুলে ড্যালটন পড়াশোনা করতেন। স্কুলে শিক্ষক ছিলেন মাত্র একজন। সেই শিক্ষক চাকরি ছাড়লে জন সেই কাজে নিযুক্ত হন। তখন জনের বয়স শুনলে অবাক হতে হয়—মাত্র বারো। সেই অল্প বয়স থেকেই জন শিক্ষকতা করে নিজের খরচ চালাতেন। বিজ্ঞানে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল, শিক্ষকতা করার সময় তিনি অঙ্ক ও রসায়ন নিজেই পড়ে নেন।

ড্যালটনের জন্মের আগের শতাব্দীতে রসায়ন-বিদরা দেখেছিলেন যে, কতকগুলি জিনিসকে আরও সরল জিনিসে আলাদা করতে পারলেও এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলিকে কখনই আলাদা করা সম্ভব হচ্ছে না। যেমন, জলকে হাইড্রোজেন-অক্সিজেনে, সাধারণ লবণকে সোডিয়াম ও ক্লোরিনে, চিনিকে

কার্বন ও জলে আলাদা করা গেলেও হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন এবং সোডিয়াম থেকে কখনই আরও সরল কিছু জিনি সতাঁরা বের করতে পারেন নি। এদের তখন নাম দেওয়া হল 'রাসায়নিক মৌল।' জল, লবণ ও চিনির মত যে জিনিসগুলি একাধিক মৌল দিয়ে তৈরি তাদের বলা হল 'রাসায়নিক যৌগ' বা যৌগিক দ্রব্য। আমরা জানি একশ'র বেশি মৌলিক পদার্থ আছে ; কিন্তু ড্যাল টনের সময়ে মাত্র ত্রিশটি মৌলের কথা জানা ছিল।

জন ড্যালটন

'পরমাণু-'র ধারণার সাহায্যে মৌলগুলির অস্তিত্ব এবং তাদের পার্থক্য ব্যাখ্যা করা যায় কিনা ড্যালটন এ নিয়ে খুব ভাবতেন। অনেক ভাবনাচিন্তা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ড্যালটন তাঁর পরমাণুতত্ত্বটি খাড়া করেন এবং তা ১৮০৮ সালে প্রকাশিত হয়।

ড্যালটনের তত্ত্বটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে বলা হল যে, কোন মৌলের পরমাণুর মধ্যে সেই মৌলের সমস্ত ধর্ম বজায় থাকে। লোহার পরমাণুকে বাড়িয়ে দেখা সম্ভব হলে আমরা অবশ্যই তাকে লোহা বলে চিনতে পারতাম। আমরা তাকে হাইড্রোজেন, সোডিয়াম বা অন্য কোন মৌল ভেবে ভুল করতাম না। ড্যালটন যা বলেছেন তার অর্থ হল, লোহার কোন্ পরমাণুকে দেখছি সেটা বড় কথা নয়, লোহার সব পরমাণুই এক রকম। সোডিয়াম, হাইড্রোজেন ও অন্যান্য মৌলের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা খাটে।

ড্যালটন আরও বলেছেন যে, বিভিন্ন রাসায়নিক মৌলের পরমাণুগুলি মিলিত হয়ে রাসায়নিক যৌগ তৈরি করে। যেমন, দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে মিশে এক 'অণু' (মলিকিউল) জল তৈরি করতে পারে। বিভিন্ন পরমাণু দিয়ে গড়া যৌগের ক্ষুদ্রতম অংশের নামই হল 'অণু' এবং এই অণুর মধ্যে যৌগের সব ধর্মই থাকে। একটি ক্লোরিন পরমাণু একটি সোডিয়াম পরমাণুর সঙ্গে মিশে এক 'অণু' লবণ তৈরি করে।

সংক্ষেপে এই হল ড্যালটনের পরমাণু-তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং আধুনিক রসায়ন বলতে গেলে এখান থেকেই শুরু হয়েছে। ড্যালটনের তত্ত্ব মোটামুটি নির্ভুল হলেও ডেমোক্রিটাসের মত ড্যালটনও বলেছেন, পরমাণু হল পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা এবং তাকে আর ভাগ করা যায় না। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই ড্যালটনের এই কথাকে মেনে নিয়েছিলেন। তারপর কয়েকজন পদার্থবিদ প্রমাণ করে দেখালেন যে, পরমাণুকে আরও ছোট ছোট অংশে ভাগ করা যায়।

টুকিটাকি

তাপ-ফটোগ্রাফি

পার্থসারথি চক্রবর্তী

সাধারণ আলোর সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র উত্তাপ-কে কাজে লাগিয়ে ফটোগ্রাফ তোলা সম্ভব। ছবি তুলবার এই অত্যাশ্চর্য সর্বাধুনিক পদ্ধতির নাম থার্মোগ্রাফি। থার্মোগ্রাফির সাহায্যে আজকাল, ফটো তোলা হচ্ছে, নানারকম জটিল রোগ নির্ণয় করাও যাচ্ছে। এ ছাড়া কলকারখানায় শিল্প-উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে এবং শত্রুর বিপদজনক মারাত্মক অস্ত্রকে আগে থেকে টের পাওয়া যাচ্ছে থার্মোগ্রাফির দৌলতে। থার্মোগ্রাফিতে বিশেষ ভাবে তৈরী ক্যামেরা দরকার। এই ক্যামেরায় শুধুমাত্র বস্তুটির তাপ ধরা পড়ে—ঐ বস্তু থেকে ঠিকরে পড়া আলোকরশ্মি নয়।

প্রায় একশ সত্তর বছর আগে বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম হার্সেল অকিষ্কার করেন যে, সূর্য-কিরণ যখন প্রিজমের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে তখন বর্ণালীর সাতরংয়ের চাইতে ইনফ্রা-রেড অংশের তাপ কিছুটা বেশী হয়। এই ইনফ্রা-রেড আলো খালি চোখে দেখা যায় না। অদৃশ্য এই আলোর নাম দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ লাল উজানি আলো। ফটোগ্রাফিক প্লেট এই ইনফ্রা-রেড তাপ বিকীরণের স্থানে বেশ অনুভূতিশীল। অবশ্য সে সময়ে বর্ণালীর এই তাপ বৈষম্য নিয়ে ফটোগ্রাফ তোলার ব্যাপার-টাকে বিশেষ কাজে লাগান হয়নি।

থার্মোগ্রাফিতে সরাসরি তাপকে বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। তারপর ঐ বিদ্যুতকে পরি-বর্ধিত করে একটা সাধারণ ইলেকট্রিক বাল্বের মধ্যে পাঠান হয়। বাল্বের উজ্জ্বলতার হ্রাসবৃদ্ধি তখন ফটোগ্রাফিক ফিল্মে ধরা পড়ে। এর থেকেই ইনফ্রা-রেড তাপ বিকীরণের উত্থান ও পতন বোঝা যায়। ভারী মজার ব্যাপার এটা—তাই না?

রঙীন থার্মোগ্রাফির প্রচলন বেশী—কেননা এতে রং গুলিকে পরিষ্কার বোঝা যায়। রং গুলিকে তাপের তারতম্য অনুসারে এভাবে নির্বাচন করা হয়: সবচেয়ে বেশী উত্তপ্ত স্থানের জন্য 'লাল' ও 'কমলা' রং, 'হলুদ' ও 'সবুজ' রং মাঝারি রকম তাপের জন্য এবং 'নীল' ও 'কালো' রং ঠাণ্ডা জায়গার জন্য। এদের ছবি রঙীন ফিল্মে পরিষ্কার ফুটে ওঠে।

আজকাল উড়োজাহাজের সূক্ষ্মতম যন্ত্রাংশ এবং ইলেকট্রনিক সার্কিট থার্মোগ্রাফির সাহায্যে সুন্দর ভাবে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। চাঁদের অন্ধকারময় অংশকে পৃথিবী থেকে থার্মোগ্রাফির সাহায্যে চমৎকার দেখা যায়। এ ছাড়া ক্যানসার, করোনারী থ্রম্বসিস ও অনেক জটিল রোগ নির্ণয়ে থার্মোগ্রাফিক খুব বেশী কাজে লাগান হচ্ছে। বড় হয়ে তোমরা এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানবে।

With Compliments from

ALPLY AGENCIES PRIVATE LTD.

47A, Chittaranjan Avenue, Calcutta-700 015

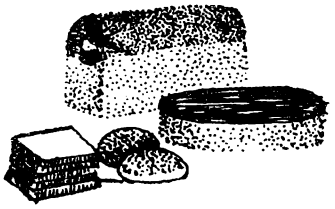

কেক পাউরুটির কথা

সতী চক্রবর্তী

কেক পাউরুটি খায়নি এমন শহরবাসী মানুষ খুব কমই আছেন। বিশেষ করে সকাল বেলায় চা পাউরুটি না হলে অনেকেরই চলে না। কেক ত সবারই প্রিয় বিশেষ করে বড় দিনের সময়। কেক কিন্তু রুটির অনেক পরে এসেছে। তাই কেকের আগে রুটির কথাই বলা যাক্। কে কবে কোথায় প্রথম রুটি তৈরী করেছিল তা ঠিক জানা না থাকলেও প্রথম রুটি তৈরী হয়েছিল খৃষ্ট জন্মের প্রায় আট হাজার বছর আগে। এখন আমরা যে সব রুটি পাই তার যথেষ্ট পুষ্টি মূল্য আছে এবং তা স্বাস্থ্য রক্ষায় সাহায্য করে। এই ধরণের প্রতি-দিনকার ব্যবহৃত ১০০ গ্রাম পাউরুটিতে আছে প্রায় ২৪৫ ক্যালোরী। প্রোটিন ৮ ভাগ, কার্বহাইড্রেট ৫২ ভাগ, আর সামান্য ফ্যাট। তাছাড়া আছে লোহা ক্যালসিয়াম ও বিভিন্ন ভিটামিন।

পাউরুটি তৈরী করতে যে আটা ময়দা লাগে তা শস্য জাতীয় উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়। এরা সব বীরুৎ শ্রেণীর উদ্ভিদ, বহুকাল আগে রেড ইণ্ডিয়ানরা আটা তৈরী করত অ্যাকর্ণ থেকে। অ্যাকর্ণ (acorn হচ্ছে ওক গাছের ফল। এর স্বাদ ছিলো তেতো। বর্তমানে যে সব আটা ময়দা লাগে পাউরুটি বানাতে তা পাওয়া যায় গম থেকে। পরিণত গম গাছের শিষে সাজান থাকে গমের দানা। গমের সাদা অংশই ময়দা। এই ময়দা জল ও লবণ দিয়ে ঠাসা হয়। এর সঙ্গে ইষ্ট্ নামক এক শ্রেণীর ছত্রাক মেশান হয়। এর পর রোদে বা গরম জায়গায় ফেলে রাখা হয়, কোহল সন্ধান বা fermentation এর জন্য। ইষ্ট্ এর মধ্যে যে উৎসেচক থাকে তা শ্বেতসার থেকে বেরিয়ে আসা গ্লুকোজ্ এর ওপর বিক্রিয়া ঘটিয়ে Co_2 গ্যাস উৎপন্ন করে। আর ঠাসা ময়দার তালকে গ্যাসপূর্ণ ও স্পঞ্জী করে তোলে। এই ময়দার তালকে আরও ঠেসে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া হয় ও খুব বেশি তাপে সেঁকা বা বেক করা হয়। এই বেশী তাপে বেক করার ফলে ভেতরের গ্যাস আয়তনে আরও বেড়ে যায়—শ্বেতসার জিলোটিনে পরিণত হয় ও প্রোটিন ঘনীভূত হয় বা জমে যায় এবং অবশিষ্ট ইষ্ট্ নষ্ট হ'য়ে যায়। সামান্য মাত্রায় লবণ দেওয়ায় উৎসেচকের বিক্রিয়াগুলি যথাযথ-ভাবে সম্পাদিত হতে পারে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের সময় কেটে যেত, খাদ্যান্বেষণে। সেই খাদ্য ছিল red meat অর্থাৎ রক্তাক্ত মাংস। তুষার যুগে চাষের সম্ভবনাও ছিল না। 'পুরাণো প্রস্তর যুগের মানুষেরা ঘাসের বীজ খেত। ঘাসের বীজ দাঁত দিয়ে ভাঙ্গা কষ্টকর ছিল। তাই সে যুগের মানুষ বীজ ভেঙ্গে গুড়ো করে খেতে শিখল। এই ভাবেই সুরু হল ময়দা তৈরী। তারপর তারা দেখল ময়দা খেতে আরও সুস্বাদু লাগছে তাতে একটু জল মেশালে তারপর ঐ

জল মেশানো ময়দা উত্তপ্ত পাথরের উপর রাখলে আরও স্বাদযুক্ত হল। এইটেই বোধ করি প্রথম তৈরী রুটি। এই রুটি প্রস্তুতের প্রথম কৃতিত্ব সম্ভবতঃ স্ত্রীজাতির। পুরুষেরা যখন বনে-বাদাড়ে বন্য পশুর পশ্চাদ্ধাবনে ব্যস্ত মেয়েরা তখন গুহাকন্দরে ঘাস রোপন, খাদ্যশস্য উৎপাদন ফলমূল সংগ্রহও খাদ্যপ্রস্তুতের প্রচেষ্টা করে থাকত।

প্রাচীন মিশরীয়েরা ক্ষেতে প্রচুর গম চাষ করত। গম পরিণত হলে সোনার কাস্তে দিয়ে ফারুক প্রথম সেই ফসল কেটে ফসল তোলা সুরু করতেন। মিশরীয়েরাই প্রথম রুটিতে ইষ্ট মিশ্রিত করে। একে তখন বলা হত (leavened) লিভেণ্ড ব্রেড।

উদিত রোমানেরা প্রথম বেকার্স সপ তৈরী করে। এখানে নানা ধরণের পাউরুটি বিক্রি হত। হাজার দুই বছর আগে ব্রিটেনের লোকেরা বার্লির রুটি খেত। তারপর রাই থেকে তৈরী (Maslin) মসলিন নামক রুটিও খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে।

রোমান যুগে গম পেশাই এর কাজ চলত গাধার সাহায্যে। এরপর জলশক্তির সাহায্যে। ১০৮০ সালে ব্রিটেনে প্রায় ৭৫০০ হাজার জলচালিত গম ভাঙ্গানর কল ছিল এবং পরে বায়ুচালিত কলও আবিষ্কার হয়।

মধ্যযুগে বেশির ভাগ রুটি গাঢ় বাদামী রঙের শক্ত খস্‌খসে ছিল। এগুলি গরীবের খাদ্য ছিল। নরম সাদা রুটি ধনীদেরই কিনে খাওয়ার সাধ্য ছিল। সাদা পাউরুটির চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তৈরীও হতে লাগল বেশি এবং ব্রাউন রুটিই যে বেশি পুষ্টিকর তা তখনকার লোকে জানত না। পুরো গম থেকে পাওয়া আটার রুটিই হচ্ছে ব্রাউন ব্রেড বা বাদামী রুটি।

১৯০০ সালে নতুন ধরণের মিল আবিষ্কার হল। একে বলা হল রোলার মিল Roll r mill)। এই মিলের সাহায্যে গম থেকে খোসা স্বতন্ত্র করে ময়দা প্রস্তুত করা সহজ হল। বর্তমানে গমের চাহিদা এত বেশি যে এখন জটিল যন্ত্রের আবিষ্কার হ'য়েছে যা ফসল কাটা থেকে সুরু করে ময়দা প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। এই মেসিনকে বলা হয় কম্বাইণ্ড হারভেষ্টার (Combined Harvester)। এই যন্ত্র কাটাই মাড়াই, ঝাড়াই ও পেষাই সব কাজই করে।

আধুনিক কালে পাউরুটি প্রস্তুত শিল্পকলার প্রতিটি পর্যায়ই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদিত হ'য়ে থাকে। রুটির উপাদানগুলি ওজন করা থেকে সুরু করে মায় পাউরুটি মোড়কে ভরা অবস্থায় বেরিয়ে আসা পর্যন্ত এই সমস্তই সম্পন্ন হয় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে।

আমাদের দেশে রুটী প্রস্তুত সীমাবদ্ধ ছিল ক্ষুদ্রায়তন বেকারীর কারখানায়। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতিতে স্বয়ং ক্রিয় যন্ত্রের আবিষ্কারে পাউরুটী প্রস্তুত বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত হ'য়েছে। আমাদের দেশে প্রথম সরকারী প্রচেষ্টায় রুটী তৈরীর বৃহৎ কারখানা স্থাপিত হয় বম্বেতে। কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া সরকারের সহযাগিতায় ১৯৮৬ সালে। উপস্থিত ভারতের নানা অঞ্চলে রুটী তৈরীর কারখানা ছড়িয়ে পড়েছে। অদূর ভবিষ্যতে গমচাষের আরও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাউরুটী আরও পুষ্টি সম্পন্ন। সহজলভ্য ও জনপ্রিয় হ'য়ে উঠবে।

এই প্রসঙ্গে পাউরুটির অন্য কাজে ব্যবহার সম্পর্কে বলা যেতে পারে। রাশিয়াতে একটি প্রথা আছে, রেষ্টুরেণ্টে খাওয়ার আগে তারা ছুরী কাঁটা চামচ এক শ্লাইটম্ রুটি দিয়ে মুছে নেয়। মধ্যযুগে ক্রুসেডাররা ছাতাপড়া রুটি তাঁদের ক্ষত-

স্থানে দিয়ে রাখতেনা এই ছাতায় এক ধরণের ভেষজ ছিল যা ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করত। এই ছাতার নাম পেনিসিলিয়াম নোটেটাম। ১৯২৯ সালে ফ্লেমিং, ফ্লোরি ও চেনের মিলিত চেষ্টায় এই ছাতা থেকে আবিষ্কার হয় যুগান্তকারী ভেষজ "পেনিসিলিন"। ল্যাবোরেটরীতে আধুনিক ছাত্রেরা তাদের পেন্সিলের সূক্ষ্ম ড্রইং ও পেন্সিলের দাগ তুলতে এই পাউরুটির ব্যবহার করে থাকে। এই হল পাউরুটির ইতিহাস।

এরপর আসি কেকের কথায়। আমরা জানি মানুষ যত সভ্য হচ্ছে তার রুচিরও তত পরিবর্তন ঘটছে। তাই এখম মানুষের শুধু পুষ্টিকর খাদ্য হলেই চলে না তা রুচি সম্মত হওয়া দরকার। আর এই কারণেই সুস্বাদু কেকের আবির্ভাব। যদিও কেকরুটি আমাদের দেশের নিজস্ব জিনিষ নয়, তাহলেও আজ অনেকেই পরিবারের এবং বন্ধুদের বাড়ীতে তৈরী কেক পরিবেশন করে অপরিমিত তৃপ্তি পান। তবে এ তৃপ্তি কেক তৈরীর সাফল্যের উপরই নির্ভর করে।

কেক 'বেক করার পদ্ধতি রুটি তৈরী করার পদ্ধতি থেকে আলাদা নয়। একই বিক্রিয়ায় কেক প্রস্তুত হয়। বেকিং পাউডার আর উত্তাপের তারতম্যে কেকের গঠন বিন্যাস ও আকৃতি বিভিন্ন রকম হয়। এই দুইটি বস্তুর নির্ভুল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যকারিতায় ভাল কেক পাওয়া যায়। বেকিং প্রক্রিয়া চলাকালে কেকের সুগন্ধ বার হয়। বিভিন্ন উপাদানের বৈশিষ্ট্যগুলি মিলিত হ'য়ে কেকের রসনাতৃপ্তিকর লোভনীয় সুগন্ধ সৃষ্টি করে। কেকের সঙ্গে রুটির পার্থক্য হচ্ছে—কেক তৈরী করতে ডিম দুধ ফ্যাট ইত্যাদি অতি আবশ্যকীয় এইজন্য রুটি সহজ পাচ্য রোগীর পথ্য। কিন্তু কেক বেশ গুরুপাক। কেক শব্দটি এসেছে ফরাসী গ্যাতো (Gatau) শব্দ থেকে যার অর্থ হচ্ছে তৃপ্তিকর আনন্দদায়ক। ফরাসীদেশে অন্ততঃ আট ধরনের উপাদান দিয়ে কেক তৈরী হত সেই কেক তৈরীর প্রথম যুগে। পরে এই কেকে নানা ধরনের ফলের সংযোজন ঘটে। যেমন আপেল, কলা, স্ট্রবেরী, চেরী, কিসমিস নানা ধরনের বাদাম ইত্যাদি। দ্বাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে প্রথম ছোট ছোট পেস্ট্রীজাতীয় কেকের প্রচলন হয়। নর্টরডাম চার্চের ধর্মযাজকদের উপরে এই পেস্ট্রীর উপরের অংশ ছড়িয়ে দিয়ে উৎসর্গ করার রীতি ছিল তখন। সপ্তদশ শতাব্দীতে নরম্যাণ্ডি ও সারা ইউরোপে কেক তৈরী সুরু হ'য়ে যায়। এই সময়ে কফি ও কোকোর আবিষ্কারের ফলে কেকের আরও উন্নতি হয়। বিভিন্ন কাফেতে আভিজাতগণ কেক সহযোগে কফি ও কোকো পান করে অবসর বিনোদন করতেন। জানা যায় ইহুদীরা বিশেষ রন্ধন কুশলী। তাদের তৈরী কেকের তুলনা নেই। বিভিন্ন দেশের কেকের মধ্যে বিভিন্নতা ও বিশেষত্ব আছে। সুইস কেকও খুব বিখ্যাত। নানা উপলক্ষ্যে নানা ধরনের কেক প্রস্তুতের রীতি আছে। জন্মদিনে কেক কাটার প্রথা আজ অনেকের বাড়ীতেই প্রচলন ঘটেছে। যাইহোক কেক অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সাধ থাকলেও সাধ্য না থাকার জন্য প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় কেকের স্থান নেই সাধারণের। তাই স্বাস্থ্য ও পুষ্টি রক্ষাকারী পাউরুটিরই জয়ধ্বনি দিই। কারণ সবার চাইতে ভাল : পাউরুটি আর ঝোলা-গুড়।

—

হাতিয়ার থেকে যন্ত্র

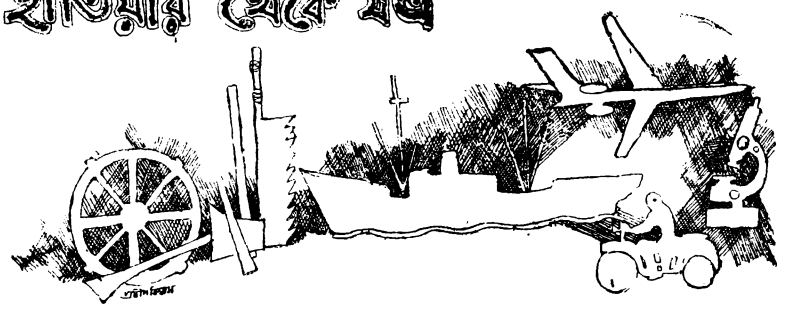

সন্ত ময়ুখের করুণা

সূর্য গ্রহণের সময় এক সুন্দর আলোর ছটা দেখা যায়—তাকে বলা হয় সূর্যচ্ছটা বা আরো ভালো কথায় ময়ুখ, আর বিদেশী ভাষায় বলা হয় করোনা—Corona! এই যে আলোর বলয় বা জ্যোতি, একে আবার প্রকৃতিতে হামেশাই দেখা যায়। কোনো জায়গাতে যদি হঠাৎ উঁচুমানের আর মাপের বিদ্যুতের ফিল্ড তৈরি হয়, তবে সেখানেই এই করোনা দেখা দেবে। ঝড়ের দিনে হঠাৎ উঁচু মিনারে বা চিমনির উপরে আগুন ঝলসে ওঠে—সেও এই করোনা। আর মধ্যযুগে নাবিকরা মাস্তুলের ডগায় এই জ্যোতি দেখেছিল—বিশেষ করে ঝড় বৃষ্টির দিনে ভূমধ্যসাগরে। তখন অবশ্য কাঠের জায়গায় লোহার মাস্তুল ব্যবহার হচ্ছে। এই আগুন জ্বলা মাস্তুল দেখে নাবিকরা নিশ্চয় ঘাবড়ে-ছিল। আর তারপর, তারা অভিজ্ঞতা থেকে জানে, মাস্তুলের ডগায় এই আলো দেখা দিলে ঝড়ের দেবতা আর জাহাজে বাজ হাঁকড়ান না। কাজেই এই আগুনের নাম হলো সেণ্ট এলমো'র আগুন। মহাত্মা সেণ্ট এলমো আগুনের নিশানা দিয়ে বজ্র-বিদ্যুৎকে ঐ জাহাজের আওতার বাইরে রাখেন। —আসলে ঝড়ের দিনে আকাশে জমানো চার্জ মাস্তুলের পথে জাহাজের গা বেয়ে জলে নেমে যায়। চার্জের নামার পথে এলোমেলোমি থাকে না বলে জাহাজে বিপদ ঘটেনা।

গত মহাযুদ্ধে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে উড়ে চলা প্লেনের ডানায়, ইঞ্জিনের ডগায় সেণ্ট এলমোর আগুন দেখা গেছে। অথচ প্লেনের ভেতরের মানুষজনের কোনো বিপদ ঘটেনি। কেন এমন হয়? আর তার উত্তর খুঁজতে মাইকেল ফেরাডের কাছে হাজির হতে হল!

ফেরাডে হলেন এমন একজন কবি—যিনি ভাষাতে কবিতা না লিখে যন্ত্রে আর লেবরেটরিতে পরীক্ষার খাতায় তাঁর কল্পনাকে লিখে গেলেন! চার্জ নিয়ে ভাবতে গিয়ে তাঁর ধারণা হলো, একটা প্রায় আঁটসাট বন্ধ পাত্রে চার্জ ভরে রাখলে, ভেতরের চার্জ হঠাৎ দুম করে হারিয়ে গিয়ে পাত্রটার বাইরে এসে হাজির হয়। সেই যাদুকর হুডিনির মত—বাক্সে-তোরঙ্গে তাঁকে বন্ধ করে রাখলে তিনি যেমন বাইরে আসবেন,—চার্জরাও তাই—বন্ধ যায়গাতে তারা থাকবেনা।···ফেরাডে একটা বরফ রাখা মুখবন্ধ বালতি নিলেন। বালতির মধ্যে ঢোকালেন একটা চেন বাঁধা বল। বলটাতে দিলেন পজিটিভ চার্জ। ঐ পজিটিভ চার্জ বালতির ভেতরের ধাতুর আস্তরণে নেগেটিভ চার্জ আবেশে তৈরি করে।

আর বালতির বাইরেও হাজির হয় পজিটিভ চার্জ। এবার বলটাকে যদি বালতির গায়ে ছোঁয়ানো হয়, তবে পজিটিভ-নেগেটিভ চার্জ মিলে গিয়ে হারিয়ে যায়—ভেতরে কোনো চার্জ নেই—অথচ বাইরের চার্জের ঘাটতি ঘটেনা। তারা যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকে।

এই বরফের বালতির ছোট পরীক্ষাটি করে ফেরাডে একটি মহাকাব্য লিখলেন—তাঁর খাঁচার পরীক্ষা! একটা ঘরের ভেতর ফেরাডে আরেকটা ঘর তুললেন। ছোট ঘরটা টিনের পাতলা পাতে মোড়া। ফেরাডে দেখেন, বড় ঘরে বিদ্যুতের ফিল্ড থাকলে ছোট ঘরে তার আভাস নেই। তেমনি ছোট ঘরে বিদ্যুৎ ফিল্ডের আভাস বড় ঘরে ধরা যাবেনা—টিনের পাত যেন চার্জের যাতায়াতে নো এনট্রি নিশানা লাগিয়ে আছে। ফেরাডের পরীক্ষা অনুসরণ করে আজকাল জালের ঘেরা ছোট্ট ঘরে, লেবরেটারিতে যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে—বাইরের ডিষ্টার্বেন্স-ঝঞ্ঝাট ভেতরে ধরা পড়েনা বলে যন্ত্রে ত্রুটি কম। বাইরের আলতো চার্জের যন্ত্রনা থেকে যন্ত্রদের নিরাপদে কাজ করার হদিশ দিলেন ফেরাডে—ঐ ঘরের মধ্যে ঘর তৈরি করে। এখানে মজা হলো চার্জ!

ধরা যাক, একটা মোটর গাড়ি। কাচের জানালা আর বাতাস-বাধা উইণ্ডশিল্ড ছাড়া গোটা গাড়ীটাই ধাতু দিয়ে তৈরি। অতএব মোটর গাড়িকে বলা যায় ফেরাডের খাঁচা—যেখানে বাইরের আবহাওয়ার চার্জের ঝামেলা ভেতরে দেখা দেবেনা। গাড়ির উপরে বজ্র-বিদ্যুৎ পড়লেও, ভেতরের লোকজন কিন্তু নিরাপদ। প্লেনেও তাই ঘটছে। তবু কখনো কখনো কিছু চার্জ লুকিয়ে চুরিয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে লিকেজের পথে ভেতরে যে হাজির হয় না। তা নয়। যে চার্জ ঢোকে তা মারত্মক না হলেও, ধাক্কাধুক্কি দিতে কসুর কিন্তু করেনা! এমন কেন হয়? সোজা কথা হলো লীকজ নন-কনডাকটার পদার্থের পথে ইনসুলেটার বস্তুতে!

কাজেই মোটর গাড়ি ইস্পাত দিয়ে না করে যদি প্ল্যাস্টিকের তৈরী হয়, অথবা করা হয় ফাইবার গ্লাসের-তবে এসব পদার্থ নন-কনডাকটার বলে বজ্র-বিদ্যুৎ থেকে আরোহীদের মাথা বাঁচানো সহজ হবে না! ফোয়াডের খাঁচায় অনুকরনে ধাতুতে গড়া গাড়ি চেপে আনন্দে 'ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' গাইতে গাইতে কালবৈশাখীর দিনে যাওয়া যায়। পুরানো রীতি ছেড়ে নতুন পথে ফাইবার গ্লাসের গাড়ি চেপে যেতে হলে গানটা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে!

আসলে কনডাকটার হলো সেই বস্তু যেখানে মসৃণ পথে দ্রুত চার্জ ছুটে যেতে পারে, আটকে থাকে না। ইনসুলেটার বা নন-কনডাকটারে চার্জ আটকে জমাট বেঁধে থাকে। জমাট হয়ে থাকলেই দু চারটা চুঁয়ে লীকেজ হয়ে চোরাগোপ্তা দলছুট হয়ে এদিক সেদিক খেতে পারে। এই দলছুটরাই সর্ব্বনেশে। এরাই গোলমাল বাঁধায়। এদের থেকে বাঁচবার উপায় কি?

উপায় সেই মা-টি মাটি! পেট্রোলের ট্যাঙ্কার একটা লোহার শিকলি মাটি ঘসটে চলে—যে চার্জ জমা হয়, জমাট বাঁধে, তাদের সিধে মাটির বুকে সঁপে টেয় ঐ শিকলি। ইনসুলেটারে গড়া গাড়িকে মাটির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে মাটির কথা ভুললে চলবে না!

মাটিতেই চার্জদের কবর দিতে হবে নইলে চলন-যন্ত্রের যন্ত্রনা বাড়ে!

মির্জা নৈশাদ

দক্ষিণমেরুর সমুদ্রের বরফ মাছ

"বরফ মাছ" মানে অবশ্য বরফের তৈরী মাছ নয়। বরফের মত সাদা এবং দক্ষিণ মেরু সমুদ্রের বরফ আকীর্ণ হিমশীতল জলের মধ্যে পাওয়া যায় বলেই ঐ মাছ "বরফ মাছ" নামে পরিচিত। মাত্র ১৯২৮।৩০ সালে হঠাৎ এই মাছ মানুষের দৃষ্টিপথে আসে। এই মাছের আবিস্কারের ইতিহাস কিছু কম রহস্যময় নয়।

নরওয়ের এক অভিযাত্রীদলের প্রাণীবিজ্ঞানী হিসাবে ডিট্‌লেফ রাস্টাড্‌ ১৯২৮ সালে দক্ষিণমেরু সমুদ্রে যান। এই অভিযানের সময় রাস্টাড কতকগুলো শ্বেতশুভ্র মাছ জলের মধ্যে দেখতে পান। ঐ মাছের তিনি নামকরণ করেন "White crocodile fish" বা "সাদা কুমির মাছ।" বুভেট দ্বীপের অদূরে, দক্ষিণ অ্যাট্‌লান্টিক মহাসমুদ্রে ষাট ডিগ্রি (৬০°) উত্তর অক্ষাংশের কাছাকাছি ঐ মাছ প্রথম রাস্টাড্‌ দেখতে পান এবং ফটো তুলে নেন্‌। ১৯২৯ সালে রাস্টাড্‌-এর স্বদেশবাসী জোহান টি, রুড্‌ দক্ষিণমেরু সমুদ্রে একদল তিমি শিকারীর সঙ্গে—VIKINGEN—নামক জাহাজে বেড়াতে যান। জাহাজটি দীর্ঘদিন মেরু সমুদ্রে তিমি শিকার করে বেড়ায়। ঐ জাহাজেরই কয়েকটি তিমি শিকারীর কাছে তিনি প্রথম শুনতে পান যে দক্ষিণ জর্জিয়া দ্বীপের খাঁড়ীতে একরকম মাছ আছে যারা একদম সাদা রংয়ের এবং যাদের গায়ে রক্ত নেই বলেই শিকারীদের বিশ্বাস। ডঃ রুড্‌ ঐসব শিকারীদের কথা বিশ্বাস করেননি। তিনি তাঁদের ঐ মাছ ধরে এনে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ অভিযানের সময়ের মধ্যে একটা মাছও তিমি শিকারীরা ডঃ রুড্‌কে এনে দিতে পারলেন না। ডঃ রুড্‌ অবিশ্বাস নিয়ে তাঁর দেশ নরওয়েতে ফিরে গেলেন।

১৯৩০ সালে স্বদেশে ফেরার পর ডিট্‌লেফ রাস্টাড্‌-এর সঙ্গে ডঃ রুড্‌-এর যোগাযোগ হয়। রাস্টাড্‌-এর কাছে মাছের ছবি দেখে তিনি প্রথম বিশ্বাস করেন যে "বরফ মাছ" আছে। সুইডেনের মৎস্য-বিজ্ঞানী ওরভার নাইবেলিন, রাস্টাড্‌-এর "white crocodile fish"এর ছবি দেখে তার গোত্র এবং বংশ পরিচয় ঠিক করেন। নাইবেলিন এই মাছের নামকরণ করেন Chnenocephalus bouvetensis (কিনোকেফালাস বুভেটেন্‌সিস্‌) এবং ঐ মাছের রক্ত যে লাল নয় তা বিশ্বাস করেন। দক্ষিণ জর্জিয়া দ্বীপের খাঁড়িতে যে মাছ পরে পাওয়া যায় নাইবেলিন তার নামকরণও করেন। তিনি এর নাম দেন Chaenocephalus aceratus (কিনোকেফালাস্‌ এসিরেটাস্‌)। আমাদের দেশের ভেট্‌কী জাতীয় মাছ যে Order Perciformes এর অন্তর্গত এরাও তার মধ্যে পড়ে। দেখতেও অনেকটা ভেট্‌কী মাছেরই মত।

এই সব ঘটনার ১৮ বছর পরে ১৯৪৮ সালে ফ্রেড্‌রিক বেয়ার নামে ডঃ জোহান রুড্‌-এর এক ছাত্র, "BRATTEGG" অভিযানে যান দক্ষিণমেরু সমুদ্রে। তিনি দক্ষিণ মেরুর ম্যাগেলন প্রণালী থেকে আবার কতকগুলো নতুন "বরফ মাছ" ধরে আনলেন। এদের নামকরণ হোল ক্যাম্প্‌সোকেফালাস্‌ ইসক্স্‌ (Champsocephalus esox)। এরাও ভেটকী জাতীয় মাছ। তারপর ১৯৫৩ সালে Oslo University'র প্রাণী বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে ডঃ রুড্‌ একটা বিরাট তিমি অভিযাত্রীদলের সঙ্গে গেলে সাউথ জর্জিয়াতে। ডঃ রুড্‌ এবং তাঁর দলবল ওখানে ৭ সপ্তাহ ছিলেন। ডঃ রুড্‌ ওখানে পৌছানোর পর ২।৩ দিনের মধ্যেই তাঁর গবেষণাগার সাজিয়ে ফেললেন।

Chaenocephalus aceratus জাতীয় তিনটি মাছ তাঁর যাওয়ার ২।১ দিনের মধ্যেই ধরা পড়ে। প্রতিটি মাছের সারাদেহ, এমনকি ঝিল্লি বা gills পর্য্যন্ত শ্বেতশুভ্র।

ডঃ রুড্ প্রথমেই মাছের রক্ত পরীক্ষা করে দেখেন যে রক্ত প্রায় স্বচ্ছ এবং বর্ণহীন। দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে দেহের বাইরে ঐ রক্ত jelly'র মত জমাট বেঁধে যায়। Centrifuge মেসিনে ঐ রক্ত সঞ্চালন করার পর তলানি হিসাবে শুধু শ্বেত রক্ত কণিকা পড়ে থাকতে দেখা যায়। রক্তের তরল অংশ বা প্লাজমা, একেবারে জলের মত স্বচ্ছ এবং রক্তের শ্বেত কণিকার পরিমাণ এক শতাংশ (১%) মাত্র। কোনো লোহিত রক্ত কণিকার চিহ্নই নেই। ঐ রক্তের মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ মাত্র দশমিক সাতষট্টি শতাংশ (·৬৭%)। এত কম পরিমাণ রক্তের অক্সিজেনের সাহায্যে বাঁচা অসম্ভব। তাছাড়া এই মাছগুলো ২ ফুট বা তার চেয়ে বেশী লম্বা। সুতরাং দেহের আয়তন কম নয়। ডঃ রুড্ রক্তে এই অত্যল্প অক্সিজেনের পরিমাণ দেখে কিছুতেই ঠিক করতে পারলেন না কিভাবে এই মাছগুলো বেঁচে আছে! আমরা জানি সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে লোহিত কণিকা আছে যার মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামে রাসায়নিক রঞ্জক পদার্থ থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ পরিচালনার জন্য লোহিত কণিকা ও হিমোগ্লোবিন অপরিহার্য্য। ঈল (eel) মাছের লার্ভাতে লোহিত রক্ত কণিকা পাওয়া যায় না কিন্তু এরা যখন বড় হয় তখন এদের দেহে স্বাভাবিক লোহিত রক্ত কণিকা পাওয়া যায়। আর Lamprey নামে আর একরকম চোয়ালবিহীন মাছ পাওয়া যায় যার রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ শুধু কম নয়, প্রকৃতিতেও একটু ভিন্ন। এই Lamprey'রা অন্য মাছের দেহের উপর শোষকের মত মুখের (sucking mouth) সাহায্যে রক্ত শুঁষে খায়। এরা পরজীবি। এই দুটি দৃষ্টান্ত ছাড়া মেরুদণ্ডী প্রাণীর ইতিহাসে কোথাও লোহিত রক্ত কণিকা বিহীন কোনো প্রাণীর সন্ধান বৈজ্ঞানিকদের জানা নেই।

বিভিন্ন প্রজাতির বরফ মাছের রক্তের অক্সিজেনের পরিমাণ দশমিক সাতষট্টি (·৬৭) থেকে দশমিক বাহাত্তর (·৭২) শতাংশ মাত্র। যতগুলো বরফমাছ অধ্যাপক রুড্ সাউথ জর্জিয়া দ্বীপের Husvik Harbor বা হসেভিক্ বন্দরে তাঁর গবেষণাগারে বসে পরীক্ষা করতে পেরেছিলেন তার মধ্যে দশমিক বাহাত্তর শতাংশের (·৭২%) বেশী অক্সিজেন কোনো মাছেই ছিল না। অধ্যাপক রুডের প্রথম প্রশ্ন হোল কিভাবে এই সাংঘাতিক Anemia বা রক্তাল্পতার মধ্যে মাছগুলো বেঁচে আছে? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন, কেমন করে এই মাছগুলোর মধ্যে লোহিত কণিকা ও হিমোগ্লোবিন অদৃশ্য হোল? ষোলোটি বিভিন্ন প্রজাতির বরফ মাছ দক্ষিণমেরু সমুদ্রের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে—প্রশ্ন দুটো সব কটি প্রজাতির মাছের পক্ষেই প্রযোজ্য। অধ্যাপক রুড্ প্রধানতঃ Chaenocephalus aceratus নামক প্রজাতির বরফ মাছের উপর তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন।

কোন পরিবেশে, কিভাবে, এই মাছগুলো থাকে তা না জানলে এদের দেহগত বৈশিষ্ট্য জানা অসম্ভব। সাউথ জর্জিয়া দ্বীপের সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী গভীর খাঁড়ির তলদেশে স্বচ্ছ জলের মধ্যে এই মাছেরা থাকে। এই জলে মাছের

জীবাণুসার

● অ্যাজোটোবেকটার ●

জমির উর্বরতা ও ফলন বাড়ায়, গাছ দ্রুত বাড়ে, ঝাঁকড়া হয় ও সতেজ থাকে, ফুল ও ফলের আকার বড় হয়, দানা পুষ্ট হয়, গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, ছত্রাক-রোগ নিয়ন্ত্রিত হয়, জমির জল ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ে।

● রাইজোবিয়াম ●

বাদাম, সয়াবীন ও সমস্ত ডালচাষে 'রাইজোবিয়াম' জীবাণুসার ব্যবহার করুন। রাইজোবিয়াম ফলন বাড়ায় এবং পরবর্ত্তী ফসলের জন্য প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন জমিতে সঞ্চিত রাখে।

প্রস্তুতকারক :-**নাইট্রোফিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ**

(ভারত সরকার অনুমোদিত)

ব্লক ডি, জয়শ্রী পার্ক কলিকাতা-৭০০০৩৪

ফোন : ৭৭-৩৩২৬, ৭৭-১৪৯০

খাদ্যের অভাব নেই এবং জলে অক্সিজেনের পরিমাণও প্রচুর। কিন্তু সারা বৎসরে এই জলে তাপের বা উষ্ণতার তারতম্য হয় শূন্য তাপাঙ্কের ২।৩ ডিগ্রি উপর থেকে এক দশমিক সাত (১·৭) ডিগ্রি নীচে পর্য্যন্ত। এই নিম্নতাপাঙ্কের মধ্যে বসবাস খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। মাছ ঠাণ্ডা রক্তের মেরুদণ্ডী প্রাণী অর্থাৎ দেহের তাপ পরিবেশের তাপের উপর নির্ভরশীল। দেহের নিজস্ব কোনো তাপ নেই। যদি পরিবেশে ১০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রা বেড়ে যায় তাহলে, সাধারণভাবে যে অক্সিজেন প্রয়োজন বেঁচে থাকার জন্য। তা থেকে দ্বিগুণ পরিমান বেশী অক্সিজেন প্রয়োজন হয় বাঁচবার জন্য। এইসব মাছেরা সাউথ জর্জিয়ার শীতল গ্রীষ্মে খাঁড়ির অগভীর জল থেকে আরো গভীর ও আরো শীতল সমুদ্র জলের দিকে সরে যায়। অর্থাৎ সব সময়ই এরা একটা নির্দিষ্ট তাপাঙ্কের জলের মধ্যেই থাকবার চেষ্টা করে। এর ফলে অক্সিজেনের প্রয়োজনটা সীমায়িত হতে পেরেছে। এদের দেহের গঠন দেখে বেশ বোঝা যায় যে এরা শ্লথ জীবনে অভ্যস্ত। মাথাটা বড়, হাঁ-মুখ বেশ প্রশস্ত; মাথার অনুপাতে দেহটি সঙ্কীর্ণ ও লম্বা, লেজও খুব বড় নয়। প্রায় স্বচ্ছ দেহ নিয়ে জলের মধ্যে অদৃশ্যভাবে ছোট ছোট মাছ শিকারের প্রতীক্ষায় নিশ্চলভাবে থাকে। মাছ পাওয়া মাত্র গিলে নিয়ে আবার নিশ্চুপ হয়ে থাকে। মুখের আয়তন ও দাঁতের বাহার থেকে বোঝা যায় এরা বেশ বড় মাছই খেতে পারে। সুতরাং একবার খাওয়ার পর দীর্ঘ সময় নেয় হজম করতে। নতুন শিকারের জন্য বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়। সুতরাং শ্লথ জীবন এদের পক্ষে স্বাভাবিক।

সাধারণ মাছের দেহে spleen (প্লীহা), kidney (বৃক্ক) এবং liver (যকৃত) প্রভৃতি জায়গায় লোহিত রক্ত কণিকা তৈরী হয়। Chaenocephalus aceratus মাছের ১৮টি spleen নিয়ে সাউথ জর্জিয়াতে বাম পরীক্ষা করে অধ্যাপক রস স্থির সিদ্ধান্তে আসেন যে এই মাছের দেহে লোহিত রক্ত কণিকা তৈরী হয় না। তাহলে শুধু plasma'র অক্সিজেন দিয়ে কি ভাবে এরা বেঁচে থাকে?

অন্য জাতের মাছ পরীক্ষা করে অধ্যাপক রুড দেখেছেন যে তাদের রক্তে পাঁচ দশমিক নিরানব্বই (৫·৯৯) থেকে ছয় দশমিক ছাব্বিশ (৬·২৪) শতাংশ পর্যন্ত অক্সিজেন আছে। ঐ অক্সিজেনের শতকরা ৯০ শতাংশ লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের অণুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। পেশী ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের জন্য যেটুকু অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় সেটুকুই বা বরফ মাছ কোথা থেকে পায়? রক্তের প্লাজমার অক্সিজেন খরচ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা পূরণ করতে হবে পরিবেশ থেকে অক্সিজেন নিয়ে শুধু তাই নয়, দেহের যে অংশ বাইরে থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে সেইখান থেকে অনতিবিলম্বে অক্সিজেনকে দেহের ভিতরে যেখানে অক্সিজেন খরচ হবে—সেখানে নিয়ে যেতে হবে। অক্সিজেন বহন করার জন্য বরফ মাছের দেহে প্রচুর রক্ত ও দেহরস আছে। তাদের হৃদ্‌যন্ত্র দেহের তুলনায় বেশ বড় এবং হৃদ্‌যন্ত্রের থেকে যে প্রধান ধমনী বেরিয়ে এসেছে, সেখানে কিছু রক্তাভ পেশী পাওয়া যায়। এ থেকে এটা

বিজ্ঞান মেলাকে

স্বাগত জানাই

পরেশ চন্দ্র কোটাল

সিঁথি, কলিকাতা।

অনুমান করা যায় যে দেহের মধ্যে প্রচুর রক্ত সঞ্চালনের ব্যবস্থা আছে এবং সেই রক্ত ঝিল্লির মধ্যে দিয়েও অনবরত যাতায়াত করছে। সাধারণতঃ সব মাছই জল থেকে দ্রব অবস্থায় অক্সিজেন ঝিল্লি দিয়ে গ্রহণ করে। কিন্তু বরফ মাছের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয় কারণ ওদের gills এর উপরের পাতলা পর্দাটা দ্রুত osmosis এর পক্ষে খুব উপযোগী নয়। তবে প্রায় সব বরফ মাছই আঁশবিহীন, যদিও ভেট্‌কি মাছের সমগোত্রীয় তারা। এই আঁশবিহীন দেহ আবরণ মারফৎ জল থেকে অক্সিজেন লেনদেন অসম্ভব নয়। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে দেহের চামড়ায় প্রচুর রক্ত নালিকা থাকলেও নানা কারণে দেহ-আবরনী মারফৎ অক্সিজেন গ্রহণ করা এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করা খুব সুবিধাজনক নয়। তাহলে কি করে বরফ মাছ দেহের এই অক্সিজেন স্বল্পতা সহণীয় করে তুলেছে?

বহু পরীক্ষার পর অধ্যাপক রুড এই সিদ্ধান্তে আসেন অক্সিজেন স্বল্পতা নিবারণের জন্য প্রচুর পরিমানে দেহরস এই মাছের দেহের মধ্যে সবসময় সঞ্চালিত হয়। বেঁচে থাকার জন্য বাতাসবিহীন বা অক্সিজেনবিহীন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বরফ মাছ অনেকখানি মানিয়ে নিয়েছে। বরফ মাছের হৃদযন্ত্রের সামনের দিকে যে Bulbous প্রকোষ্ঠ আছে—যেখান থেকে প্রধান ধমনী বা aorta বেড়িয়ে এসেছে, সেই Bulbous পরীক্ষা করে দেখা গেছে তার মধ্যে চট্‌চটে একটা প্লাসমা পিণ্ড আছে। এই প্লাসমা পিণ্ডটা প্রায় রবারের মত এবং একে খণ্ড খণ্ড করা বেশ শক্ত। ঐ পিণ্ড পরীক্ষা করে অধ্যাপক রুড দেখেছেন যে খুব অল্প পরিমাণে শ্বেত রক্ত কণিকা এবং প্লাসমা ছাড়া আর কিছু নেই।

ষোলটি (১৬) বিভিন্ন প্রজাতির বরফ মাছ, যা দক্ষিণ মেরু সমুদ্রে আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তার কোনটিতেই লোহিত রক্ত কণিকা পাওয়া যায় নি। দক্ষিণ মেরু সমুদ্রে অন্য যে সব মাছ পাওয়া গেছে তাদের বেশীর ভাগ মাছই লোহিত কণিকার সংখ্যা সাধারণ মাছ থেকে অনেক কম! হিমোগ্লোবিনের পরিমাণও তুলনামূলক ভাবে কম। অধ্যাপক রুড ও তাঁর সহকর্মীরা দীর্ঘদিন গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে হিমশীতল স্থির জলের পরিবেশই এইরকম লোহিত কণিকা বিহীন মাছের উদ্ভব সম্ভব করেছে। ঐ পরিবেশ থেকে বরফমাছকে উষ্ণতর জলে নিয়ে এলেই তার মৃত্যু অনিবার্য। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার আকাঙ্খা প্রাণী মাত্রেই সহজাত। জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়ে বেঁচে থাকবার জন্যই বরফ মাছ, উপায়ন্তর না দেখে, পরিবেশের প্রয়োজনে লোহিত রক্ত কণিকা বিহীন অবস্থায় এসেছে!

*** অজিত কুমার সরকার**

With
Best
Compliments
of
M/S. THE JANATA MACHINERY STORES
10/1/A, RAILWAY GATE,
JESSORE ROAD
P. O.—Habra, Dist.—24-Parganas.

মনের জানালা

বুদ্ধি নিয়ে আরও কিছু কথা

অন্তু বলল—তাহলে সরমাদি, আমরা সব ভোকাট্টা! জাপানীরা সব্বাই টেক্কা দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান জাত হয়ে গেল!

সরমাদি ভুরু কুঁচকে বললেন—তার মানে?

তোমরা যারা অন্তু আর সরমাদিকে চেন না, চট্ করে তাদের বলে নিই, অন্তু'র ভাল নাম—অতনু

ক্লাস নাইন থেকে টেন'এ উঠেছে এবার—ওদের বাড়ীতে লোক বলতে বাবা, মা আর ও। সরমাদি সপ্তাহে দু'দিন অন্তুদের বাড়ীতে এসে অন্তুকে পড়িয়ে যান। প্রথম প্রথম সরমাদির কাছে পড়তে অবশ্য খুবই লজ্জা করত—পরে অবশ্য সরমাদির একনম্বর ভক্ত হয়ে গেছে ও। সরমাদিকে অন্তুর পছন্দ করার সবচেয়ে বড় কারণ—পড়া বুঝিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি নানা মজাদার বিষয় নিয়ে সরমাদি আলোচনা করেন—অন্তুর কাছে যা গল্পের চেয়েও বেশী আকর্ষণীয়।

সরমাদির ভুরু কোঁচকানো দেখেই অন্তু বুঝল, খবরটা সরমাদি শোনেন নি। কিভাবে ব্যাপারটা সরমাদিকে জানানো যায় সেটা একটু ভেবে নিয়ে অন্তু শুরু করল—খবরে প্রকাশ, বিশেষজ্ঞরা বিশদ্ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখেছেন, জাপানীদের গড় 'আই-কিউ' এখন পৃথিবীর অন্য যে কোনও জাতের তুলনায় ঢের বেশী। জাপানীদের আগে ঐ জায়গায় একচেটিয়া দখল ছিল মার্কিনীদের॥ কি করে জাপানীরা মার্কিনীদের টেক্কা দিয়ে দৌড়বাজিতে জিতে গেল—তা নিয়ে আমেরিকায় বিজ্ঞানীরা এখন যার পর নাই চিন্তিত।

অন্তুর কথা বলার ভঙ্গী দেখে সরমাদি হেসে ফেললেন। অন্তু বলল—আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তো? কাগজে সত্যিই কিন্তু খবরটা বেড়িয়েছে। আপনি পড়েন নি সরমাদি।

সরমাদি বললেন—না, না, তোমার কথা অবিশ্বাস করছি না। আসলে আমি ভাবছি, যে সব বিজ্ঞানীরা জাপানীদের সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলে সার্টিফিকেট্ দিলেন তাঁরা কি পৃথিবীর সব দেশের মানুষের বুদ্ধি মেপে দেখেছেন?

অন্ততঃ আমাদের ভারতবাসীদের গড় 'আই-কিউ' যে বিজ্ঞানীদের জানা নেই তা হলফ্ করে বলতে পারি।

—তাই নাকি? অন্তু বেশ অবাক হয়েছে বোঝা গেল।

—তবে তোমায় বলি শোন। সরমাদি শুরু করলেন। বুদ্ধির ব্যাপারে জাতিগত তফাৎ-এর ব্যাপারটা নিয়ে এই ধরনের এক হৈ চৈ হয় বছর বারো আগে। অনেক বছর আগে আমেরিকায় সাদা মানুষদের তুলনায় কালো এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু মানুষদের পড়াশুনোর সুযোগ সুবিধে

ছিল কম। ওদেশে সাদা-কালোয় রেষারেষি তো আজকের নতুন ব্যাপার নয়, সেই কোন যুগ থেকে তা ওদের রক্তের মধ্যে মিশে গেছে। যাই হোক, আমেরিকার কালো মানুষদের ছেলেমেয়েরা যে পড়াশুনোর ব্যাপারে সুযোগ সুবিধে পাচ্ছে না সে দিকটায় নজর গেল ওদেশের কর্তৃপক্ষের এবং ওঁরা এমন কিছু ব্যবস্থা নিলেন যাতে পড়াশুনোর ব্যাপারে সাদা-কালোরা সমান সুযোগ পায়। তা সত্ত্বেও বছর কয়েক পর দেখা গেল, সাদা ছেলেমেয়েরা কালোদের তুলনায় পড়াশুনোর ব্যাপারে অনেকটাই এগিয়ে যাচ্ছে—পরীক্ষার ফলও ওদের অনেক ভালো হচ্ছে।

কেন এটা হচ্ছে সেটা বোঝাতে গিয়ে আর্থার জেনসেন নামে জনৈক বিশেষজ্ঞ ১৯৬৯ সালে লিখলেন—আমেরিকার সাদা ছেলেমেয়েদের তুলনায় কালোদের বুদ্ধি অনেক কম; সেই কারণেই এরা পড়াশুনোয় সুবিধে করতে পারছে না।

জেনসেন তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে দেখলেন—সাধারণ বুদ্ধির পরীক্ষায় কালোরা সাদাদের তুলনায় দলগতভাবে অন্ততঃ ১০ থেকে ১৫ পয়েন্ট কম পাচ্ছে॥

—বুদ্ধির পরীক্ষা বলতে, ইন্‌টেলিজ্যান্স টেস্ট মানে 'আই-কিউ' মাপার অভীক্ষাগুলোকে বোঝেন হচ্ছে, তাই তো?

—ঠিক তাই। বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি দিয়ে দেখা গেল—সাদাদের তুলনায় কালো ছেলেমেয়েদের বুদ্ধাঙ্ক বা 'আই-কিউ' ১০ থেকে ১৫ পয়েন্ট কম। জেনসেন বলতে চাইলেন, নেহাৎ জীনগত কারণেই এটা হচ্ছে; অর্থাৎ, বংশগতির জন্য কালো মানুষদের ছেলেমেয়েরা সবসময়ই কমবুদ্ধিসম্পন্ন হবে। জেনসেনের ঐ মত কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞানীই মেনে নিলেন না। ওঁরা দেখালেন, কালো এবং সাদা মানুষদের মধ্যে বাইরের চেহারা বা আচার আচরণের দিক থেকে যতই অমিল থাকুক না কেন—তাঁদের শরীরের মধ্যেকার জীনের গঠন বা আকৃতির মধ্যে তেমন কোন তফাৎ এ যাবৎ ধরা পড়ে নি। সুতরাং বংশানুক্রমের ধারায় কোনো বিশেষ জাতের মানুষ অন্য জাতের তুলনায় কম বা বেশী বুদ্ধিসম্পন্ন হবে—এমন কথা শারীরবিজ্ঞানীরা কোন সময়ই বলতে পারছেন না।

অন্তু মন দিয়ে সরমাদির কথাগুলো শুনছিল। সরমাদি একটু থামতেই বলল—কিন্তু

—এই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন মনোবিজ্ঞানীরা। ওঁরা বলেছেন—বুদ্ধি মাপার জন্য বিশেষ অভীক্ষা বা ইন্‌টেলিজ্যান্স মূলতঃ তৈরী হয়েছিল সাদা মানুষদের উপযোগী করেই। ফলে সেগুলির সাহায্যে কালো ছেলেমেয়েদের যে 'আই-কিউ' বা বুদ্ধাঙ্ক বেরিয়েছে তা দিয়ে তাদের বুদ্ধির সঠিক পরিমাণ বের করা অসম্ভব।

সরমাদি এবার ঘড়ি দেখলেন। তারপর অন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন—বুদ্ধি মাপার ব্যাপার স্যাপার নিয়ে কি বলেছিলাম তোমার মনে আছে?

—শতাব্দীর প্রথম দিকে ফরাসী মনোবিজ্ঞানী—আলফ্রেড বিন প্রথম দেখিয়েছিলেন—কোনও শিশুর শরীরের বয়স যেমন বাড়ে তার মনের বয়সও সেই অনুপাতে বাড়ে। সিঁমো নামে এক সহকারীর সাহায্যে বিনে সাহেবই প্রথম ইনটেলিজ্যান্স টেষ্ট বা বুদ্ধির অভীক্ষা বানিয়েছিলেন।

—ঠিক ঠিক মনে রেখেছ দেখছি। তোমার 'আই-কিউ' এর প্রশংসা করতে হচ্ছে। সরমাদি মুচকি হাসলেন।

অন্তু লজ্জা পেল। বলল—ধ্যাৎ।

সরমাদি বললেন—আসলে কি জান, শ'য়ে শ'য়ে বুদ্ধির অভীক্ষা বেরিয়েছে এখন। মুশকিলটা হ'ল—যে অভীক্ষাটা বাঙালী ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে ভাল খাটে—অন্য প্রদেশের বাসিন্দাদের 'বুদ্ধাঙ্ক' তা ঠিকমত বের করতে পারে না। পারবেই বা কি করে বল? ধর, কোনও বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল—রসগোল্লা আর বলের মধ্যে মিলটা কোথায়? এমন যদি হয়, বাচ্চাটা কোনদিন রসগোল্লা চোখে দেখে নি—সে বলতেই পারবে না যে দু'টো জিনিষই গোলাকার। সুতরাং বুঝতেই পারছ, পৃথিবীর সমস্ত জাতের সমস্ত মানুষের উপযোগী কোনও বুদ্ধির অভীক্ষা এখনও পর্যন্ত তৈরী করা সম্ভব হয় নি, আর যতদিন তা না হচ্ছে, পৃথিবীর কোনও বিশেষ জাতের মানুষকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলে সার্টিফিকেট দিলেও—বাকী সবাই যে তা মেনে নেবেন না, তা তো বলাই বাহুল্য।

* অমিত চক্রবর্তী

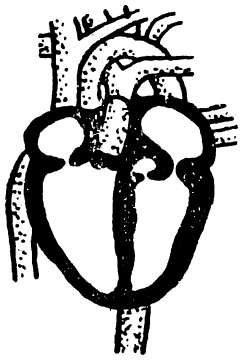

খোদার উপর খোদকারি !

খবরটা শুনেছো ছোটমামা ? গাবলু তোমাকে বলেছে কি ?—ছোটমামা ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই টুম্পার প্রশ্ন।

সমাচারটি কি ? — আরাম কেদারায় গা এলিয়ে বসলো ছোটমামা।

—গাবলুর বন্ধু অন্তকে চেনো তো ? অন্তর জ্যাঠামশায়ের হার্টে একটা অপারেশন হয়েছে ! হার্টের ভালভের গণ্ডগোল ছিল—

সত্যবাবু বললেল—হ্যাঁ, এ ব্যাপারটার তারিফ করতে হয়। একেই বলে খোদার ওপর খোদকারি ! বুকের ভিতর হার্ট, আবার তার ভেতরে গণ্ডগোল। কি করে অপারেশন হয় ভাবতেও অবাক লাগে !

—আচ্ছা ছোটমামা, তুমি হার্ট অপারেশন করতে দেখেছো ? গাবলু এসে কখন যে বসে পড়েছে কেউ খেয়ালই করে নি।

ছোটমামা হাসলো। ডাক্তারী পড়তে হলে এসব তো দেখতেই হবে, শিখতে হবে।

—আচ্ছা ছোটমামা—ছোটমামাকে মাঝপথে থামায় টুম্পা। আগে বরং জেনে নি, কোন রোগীর হার্টে অপারেশনের দরকার আছে কি না সেটা তোমরা বোঝ কি করে ? সব 'কেস'ই তো অপারেশনের' কেস' নয় ?

ছোটমামা বলল—সে তো নিশ্চয়। প্রথমেই জানতে হবে হার্টের কোনখানটা জখম হয়েছে। এর জন্য দরকার ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাম—এটা তো তোরা জানিসই।

—ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাম মানে ই. সি. জি-র কথা বলছো তো ? সেদিনই তো বলছিলে হার্টের বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপের রেকর্ড ওটা। হার্টের কোন অংশে গণ্ডগোল দেখা দিলে 'ই. সি. জি' রেকর্ডেও তার ছাপ পড়বে। ঠিক বললাম তো ?—টুম্পা ছোটমামার দিকে তাকায়।

—অবশ্য আজকাল হাসপাতালে 'আর্টেরও-গ্রাফি'ও করা হয়, অর্থাৎ বিশেষ একধরণের রঙ ইঞ্জেকশন দিয়ে ধমনীতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যেটা রঞ্জনরশ্মির সামনে অস্বচ্ছ। এর পর বিশেষ যন্ত্রের 'এক্স-রে' চোখ দিয়ে দেখা হয়। সেটা ধমনী বা শিরার মধ্যে কি ভাবে যাচ্ছে। 'করনারী ধমনী'-মানে যে সব রক্তনালীগুলো হার্টের পেশীতে রক্তের যোগান দেয়, তাদের মধ্যে দিয়ে রক্ত ঠিকমতো চলাচল করছে কি না, সেটা বোঝার পক্ষে এটা খুব ভাল উপায়। এছাড়াও রোগীর স্বাস্থ্য, রক্তচাপ, রক্তের নানা পরীক্ষা—এসব তো আছেই ! সব কিছু পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা যদি মনে করেন 'অপারেশন' না হলেই নয়, রোগীকে বাঁচান মুস্কিল —তবেই হার্টের ওপর ছুরি-কাঁচি চালান হবে।

সত্যবাবু এতক্ষণ ছোটমামার কথা শুনছিলেন। ছোটমামা থামতেই জিজ্ঞাসা করলেন—সাধারণতঃ কি ধরনের হার্টের রোগে অপারেশন দরকার হয় ?

ছোটমামা একটুক্ষণ চিন্তা করে বলল—অনেক সময় আমরা বলি না, জন্মগত হার্টের দোষ? এই সব জন্মগত হার্টের আকার-আকৃতির গোলমালে হার্ট-সার্জারি খুব দরকারী হয়ে পড়ে। তেমনি আবার করনারী ধমনীতে কোন বাধা থাকলে হার্টের পেশীতে রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আবার 'রিউম্যাটিক ফিভার' মানে বিশেষ ধরণের জীবাণুর আক্রমণে হার্টের অংশবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রোগীর অবস্থা খারাপ হতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে সাধারণত 'অপারেশন' না করে উপায় থাকে না। টুম্পা বলল—তুমি ঐ যে বললে জন্মগত হার্টের দোষ, সেই ব্যাপারটা কি?

আরামকেদারায় হেলান দিয়ে ভাল করে বসল ছোটমামা। —মোটামুটি হিসেব বলে প্রতি হাজারটা বাচ্চার মধ্যে প্রায় আটজন হার্টের গণ্ডগোল নিয়ে জন্মায়। অর্থাৎ কিনা, মায়ের পেটের মধ্যে বাচ্চা যখন বড় হচ্ছে, তার হার্টের অংশবিশেষ পরিপূর্ণ-ভাবে বেড়ে ওঠে না।

—অর্থাৎ?

—যেমন ধর হার্টের মধ্যে ডান আর বাঁদিকের কুঠুরীগুলোর মধ্যে পার্টিশন দেওয়াল থাকে। রক্ত তার মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না। অথচ জন্মানোর পরে পরীক্ষায় ধরা পড়লো—ঐ 'পার্টিশন' মানে দেওয়ালে একটা ছোট্ট ফুটো আছে। কিংবা ধর—হার্টের কোন একটা 'ভালভ্' ঠিকমতো আকারের নয়, ফলে রক্তচলাচল আটকে যাচ্ছে। সেখানে অপারেশন করে 'ফুটো'টা বন্ধ করে দেওয়া হলো বা হার্টের ভালভ্ বা এমন কি ছোটখাট রক্তনালীও, কৃত্রিম ভালভ্ বা প্লাষ্টিকের রক্তনালী বসিয়ে পাল্টিয়ে ফেলা হলো।

সত্যবাবু বললেন—সাধারণতঃ যে সব বাচ্চা হার্টের গণ্ডগোল নিয়ে জন্মায়, তারা সাধারণতঃ বাঁচে না।

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লো ছোটমামা —বিশেষ করে আমাদের মতো গরীব দেশে তো বটেই। দেখবেন, জন্মের সময় যেসব ব্লু-বেবি জন্মায়, মানে যাদের ঠোঁট বা গায়ের চামড়া নীল—সেই বাচ্চারা বাঁচেই না প্রায়।

টুম্পা বলল—কেন?

আসলে ওদের জন্মের আগে থেকেই হার্টটা ঠিক নেই, ফলে হার্ট থেকে ফুসফুসে রক্ত ঠিকমতো যায় না, রক্তেও অক্সিজেন মেশে কম। যেহেতু রক্তে অক্সিজেন কম থাকলে, রক্তের রং হয় একটু নীলচে, ঠোঁট বা অন্য পাতলা চামড়ার নীচে রঙটাও দেখায় নীলচে। বাইরের দেশগুলোতে এখন অপারেশনও হয় খুব সূক্ষ্মভাবে, যন্ত্রপাতিরও এলাহি আয়োজন, ফলে ঐরকম ব্লু-বেবী জন্মালে ডাক্তাররা বাচ্চার একদিন বয়সেও অপারেশন করে বাচ্চাকে বাঁচিয়ে দেন।

টুম্পা বললো—আচ্ছা ছোটমামা, একটা ব্যাপারে একটু খটকা লাগছে। হার্ট শরীরে পাম্প করে পাঠায়। সেই হার্টে যদি অপারেশন হয়, শরীরের অন্য অংশে রক্ত যাবে কি করে?

—ছোটমামা হাসলো। আসলে হার্ট-অপা-রেশনের সময় দুটো জিনিষ ভীষণ দরকার। একটা হচ্ছে হার্ট-লাঙ-যন্ত্র—মানে যতটা সময় ধরে অপারেশন চলবে, রক্তটা হার্টের বদলে ঐ যন্ত্রটার মধ্যে দিয়ে বইতে থাকে, যন্ত্রটাই সাময়িকভাবে সারা শরীরে রক্তটা পাম্প করে পাঠাতে থাকে। আর অন্য ব্যাপারটা হচ্ছে 'হাইপোথার্মিয়া'—অর্থাৎ শরীরের তাপমাত্রা ঐ অপারেশনের সময় কৃত্রিম-ভাবে কমিয়ে ফেলা হয়, যাতে শরীরের কোষগুলো

কাজ করে কম—অক্সিজেনের চাহিদাও কম থাকে।

সত্যবাবু বললেন—বিজ্ঞান কতটা এগিয়েছে ভাব একবার! খেয়াল আছে, কয়েকবছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার সার্জেন ডাঃ বার্ণাড একজনের শরীর থেকে গোটা হার্টটা তুলে অপরের শরীরে বসিয়ে দিয়েছিলেন?

ছোটমামা বলল—হার্ট-অপারেশনের ক্ষেত্রে সেটা একটা যুগান্তরকারী ঘটনা বলতে পারো। তবে এ ব্যাপারটা এখনও প্রায় গবেষণার স্তরেই আছে। সবথেকে বড় সমস্যা হলো শরীরের মধ্যে বাইরের একটা জিনিষ বসিয়ে দিলে শরীর তাকে শত্রু ভাবে, যতক্ষণ না তাকে বাতিল করতে পারে ততক্ষণ শান্তি নেই। এই যে সমস্যা—বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলে 'ইমিউনোলজিক্যাল বেরিয়ার' একে জয় করতে পারাটাই বিজ্ঞানীদের এখন চরম লক্ষ্য।

* সুভাষ সান্যাল

আবিষ্কারের পেছনে

ব্যাঙের পা নাচলো বলে?

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ। স্কুলে স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা হচ্ছে। বাগবাজার ষ্ট্রীট ধরে হাঁটছি। পাঁচ-সাতটি ছেলে-মেয়ে হাতে বই খাতা নিয়ে কিচির মিচির করতে করতে পাশাপাশি চলছে। দিনের আলো নিভে গেছে, পুরো অন্ধকার তখনও নামে নি। একটি মেয়ে তার বন্ধুদের বললো, ছাখ্, কাল বিজ্ঞান পরীক্ষা, আমার ভয় করছে, যদি লোড শেডিং হয়ে যায় বাড়িতে পড়তে পাব না.'। তার কথা শেষ না হতে হতেই রাস্তার দোকানগুলোর আলো নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটি ছেলে বলে উঠ্লো 'দেখলি শিউলি, তুই কেন লোড শেডিং-এর নাম করলি, তাই ত এমন হয়ে গেল!' পাশে ছিল শিউলির দিদি সোনা। সে বললো যত নষ্টের গোড়া ব্যাঙ্। তার পা না নেচে উঠলে ত গ্যালভানি কিছুই টের পেতেন না। ব্যাটারি-ফ্যাটারি কিছু আবিষ্কার হত না। এভাবে বিদ্যুতের আলোও জ্বলত না। আমরা সবাই হারিকেন-লম্ফ নিয়ে পড়তাম। বিদ্যুতের ভরসায় থাকতাম না।'

শুধু সোনা-শিউলিরাই নয়, অনেকে মনে করেন পৃথিবীতে এমন কতকগুলো আবিষ্কার হয়েছে যেগুলো কোনদিনই হত না যদি না ঐ ব্যাঙ্ নাচার মত ঘটনাগুলো ঘটতো। ইটালির বিখ্যাত বিজ্ঞানী লুইগি গ্যালভানি (১৭৩৭-৯৮) সত্যিই ভাবতে পারেন নি এমন ঘটনা ঘটবে। তিনি ছিলেন ইটালির বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমি বা শরীরস্থান-এর অধ্যাপক। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তার হাত খুব পাকা—এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মহলেও তাঁর তখন খুব নাম।

১৭৯০ সাল। গ্যালভানির বয়স ৫৩। একদিন তিনি ব্যাঙের পায়ের পেশী নুন জলে ভিজিয়ে তামার তারে ঝুলিয়ে রাখেন। একটু জোরে হাওয়া বইলে হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করেন পায়ের পেশী

যখনই একটি লোহার রেলিং-এ লাগছে তখনই লাফিয়ে উঠছে। ব্যাপারটা তাঁর কাছে কী রকম অদ্ভুত ঠেকলো। ঘটনাটি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি পরপর অনেকগুলি ব্যাঙের পায়ের পেশী ঐভাবে বারান্দায় তামার তারে ঝুলিয়ে দেখেন সেই একই ঘটনা ঘটছে। বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের মাষ্টার মশায়ের এই কাণ্ড দেখে ত অবাক। কোন কিছু বুঝতে না পেরে তারা তাঁকে 'ব্যাঙ্ নাচানো অধ্যাপক' বলে মজা করতে লাগলো। এই খবর সারা ইটালিতে ছড়িয়ে পড়লে তাঁকে ঐ নামেই সকলে ডাকতে থাকে।

গ্যালভানি ভাবলেন, ব্যাঙের পায়ের স্নায়ুতে নিশ্চয় বিদ্যুৎ আছে। মাংস-পেশীটি যখনই লোহার গায়ে লাগছে তখনই ঐ পেশীর মাধ্যমে তামা-লোহার সংযোগ হচ্ছে এবং তারই ফলে বিদ্যুৎ ব্যাঙের পা হয়ে মাংস পেশীকে সঙ্কুচিত করছে।

গ্যালভানির এই ব্যাখ্যা তাঁরই দেশের আর এক বিজ্ঞানী আলেসসান্দ্রো ভোল্টা (১৭৪৫-১৮২৭) মেনে নিতে পারেন নি। এজন্য তখন এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়। ভোল্টা পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীবিদ্যা পড়াতেন; বিদ্যুতের উপরও তাঁর গবেষণা অনেক। ইলেকট্রো-ফোরাস উদ্ভাবনের কৃতিত্ব তাঁরই। তিনি বলেন, ব্যাঙের মাংস পেশীতে বিদ্যুৎ নেই। লোহা-তামার মত দুটি ভিন্ন ধাতুর মাংসপেশীতে লেগে থাকা নুন জলের মাধ্যমে সংযোগ হচ্ছে বলেই বিদ্যুৎ প্রবাহ হচ্ছে। জিভের উপরে তামা, নিচে দস্তার পাত রেখে একটি তার দিয়ে দুটিকে ছোঁয়ালে যে কেউ এটা বুঝতে পারবেন।

ভোল্টা পরে অ্যাসিডের দ্রবণে আরও ভাল ফল পান এবং গ্যালভানির পরীক্ষার প্রায় দশ বছর পর তিনি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটিকে জানান যে, তামা-দস্তা-তামা-দস্তা....এভাবে কয়েকটি চাকতিকে উপর-উপর সাজিয়ে তাদের মাঝখানে নুন জল বা এ্যাসিডে ভেজা কাপড়ের টুকরো রেখে একেবারে উপর-নিচের দুটি ভিন্ন চাকতিকে তার দিয়ে ছোঁয়ালে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়। এটিই হল বিখ্যাত ভোল্টীয় স্তূপ। তাঁর আর একটি বিখ্যাত পরীক্ষা হল 'ক্রাউন অভ্ কাপস্'। এতে তিনি দেখালেন, একটি পাত্রে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে তামা ও দস্তার দণ্ড ডুবিয়ে তাদের বাইরে থেকে সংযোগ করলে বিদ্যুৎপ্রবাহ হয়। ১৮০১ সালে ভোল্টা প্যারিসে গেলে নেপোলিয়ন তাঁর এই পরীক্ষা দেখে মুগ্ধ হন। এভাবেই বৈদ্যুতিক ব্যাটারির ব্যবহার ও চলবিদ্যুৎ (কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি) নিয়ে পড়াশুনা পৃথিবীতে শুরু হয়।

বিজ্ঞানের এত বড় আবিষ্কার শুধু চান্সের উপর হল, ভাবতে অবাক লাগে। এই আবিষ্কার যতই আকস্মিক বলে মনে হক, একটা কথা বোধ হয় আমরা ভুলে যাই যে, প্রাণিদেহে বিদ্যুৎ আছে কিনা তা জানার জন্য গ্যালভানি বৈদ্যুতিক মাছ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছিলেন। ব্যাঙের মাংস-পেশীর মধ্যে সেই পরীক্ষাই তিনি করতে চেয়েছিলেন। জোরে হাওয়া বওয়া, ব্যাঙের পেশী লোহায় লাগা, এবং তা গ্যালভানির নজরে আসা—সবই এক একটা 'চান্স' ঠিকই। কিন্তু তা কাজে লাগানোর মত মানসিক প্রস্তুতি তাঁর আগেই ছিল। তাই তাঁর মনে প্রশ্ন উঠেছিল, ব্যাঙের পা নেচে ওঠে কেন? তারই ফল হল আজকের ব্যাটারি। এই জিজ্ঞাসু মন যাঁদের নেই, 'চান্স' তাঁদের অলক্ষ্যেই থেকে যায়, আবিষ্কার আর হয় না।

* যুগলকান্তি রায়

অবিশ্বাস্য!

১৮০০ সালের ঘটনা। ফ্রান্সের আভেরণ-এর জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে পাওয়া এক ছেলেকে নিয়ে ইয়োরোপের বিজ্ঞানী মহলে সে কি তোলপাড়! ছেলেটার বয়স বছর দশ-বারো, তবে মনস্তাত্বিক পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল-ছেলেটির বুদ্ধি বছর দু'-তিনের বেশী নয়। ছেলেটার আচার আচরণ বন্যপ্রাণীর মত; বোঝাই গেল খুব শিশু অবস্থা বাবা-মার কাছে থেকে হারিয়ে গিয়ে জঙ্গলে পশুদের সান্নিধ্যে ও বড় হয়েছে। ফলে কথাবার্তা বলতে পারে না; জন্তু জানোয়ারের মত সবকিছু শোঁকে—তা সে কোনো খাবারই হোক বা জলে ভেজা ঘাস মাটিই হোক; প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও ছেলেটি জামাকাপড় না পড়েই দিব্যি আরামে থাকে! যাতে জঙ্গলে ছেলেটি আবার পালিয়ে না যায় তার জন্য বড়সড় একটা খাঁচায় রেখে দেওয়া হ'ল তাকে; নাম দেওয়া হ'ল 'ভিক্টর'।

ফিলিপ পিনেল তখনকার ফ্রান্সের এক নামকরা মনোবিজ্ঞানী, ভিক্টরকে পরীক্ষা করে বললেন—ছেলেটি নেহাতই জড়বুদ্ধি—ওকে আবার স্বাভাবিক সভ্যমানুষ করে তোলার চেষ্টা বৃথা যাবে। ইটার্ড নামে পিনেলের এক ছাত্র কিন্তু গুরুর মতকে সরাসরি অস্বীকার করলেন। উনি বললেন—ভিক্টরের যে বুদ্ধি ২-৩ বছরের শিশুর মতই রয়ে গেছে তার কারণ—একদম শৈশবস্থা থেকেই ও সভ্য সমাজের কাছ-ছাড়া; বনে জঙ্গলে বড় হয়েছে, বন্য প্রাণীদের সঙ্গে থাকতে থাকতে বন্যতা ওকে গ্রাস করেছে। ইটার্ড জোর দিয়ে বললেন—সভ্যমানুষের সান্নিধ্যের মধ্যে থেকে ছেলেটি যদি শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ পায় তবে কিছুদিনের মধ্যেই ও আবার বুদ্ধিমান, সভ্য মানুষ হয়ে উঠবে! নিজের মতটাকে হাতে নাতে প্রমাণ করার জন্য ইটার্ড ভিকটরের শিক্ষাদীক্ষার ভার নিজের হাতেই নিলেন।

ভিক্টরের শিক্ষা শুরু হওয়ার পর প্রথম প্রথম ভাল ফলও পাওয়া গেল—ও কিছু কিছু শব্দ উচ্চারণ করতে শিখল ও ওর যা দরকার তা চক্ দিয়ে শ্লেটে লিখতেও পারত ও; যে পরিচারিকা ওর দেখাশোনা করতো—তাকে যে ভিক্টর পছন্দ করে তাও বোঝা গেল ওর হাবভাবে! ১৮০১ সালে ফ্রান্সের অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সে ইটার্ড জানালেন—প্রথম ন'মাসের ট্রেনিংএ ভিক্টর দারুণ উন্নতি করেছে।

ব্যাস্, ঐ পর্যন্তই। তার পরের প্রায় ৫ বছরে ভিক্টর আর নতুন কিছুই শিখতে পারল না—ইটার্ডও হাল ছেড়ে দিলেন। ভিক্টর বেঁচে ছিল ৪০ বছর পর্যন্ত। সবচেয়ে বড় কথা, ভিক্টরের ব্যাপারে কার মতটা ঠিক ছিল—পিনেলের না ইটার্ডের তার মীমাংসা আজও মনোবিজ্ঞানীরা করে উঠতে পারেন নি।

———

With the Best Compliments
from
A WELL WISHER

এতদিন এই বিভাগে তোমাদের বানানো মডেলের কথা লিখেছি। এবারে আমি নিজেই তোমাদের একটা মডেল উপহার দিই। খুবই সাধারণ, কিন্তু খুব কাজে আসে। তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে আবহাওয়ার খবরে বলা হয় আজকের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩০ মিলিমিটার। তোমরা রেন্-গজ দিয়ে এটা মাপতে পারো। কোন জায়গায় বৃষ্টি হলে কত ফোঁটা জল পড়ল তা হিসেব করা সম্ভব, তাই বুদ্ধি করে একটা উপায় বের করা হয়েছে। একটা লম্বা চোঙ জোগাড় কর। বাড়ীর লাগোয়া বাগান বা উঠোন থাকলে এই চোঙ্‌টি স্থায়ীভাবে বসাও। চোঙের নীচের দিকে একটা বাটি থাকবে আর খোলামুখে একটা ফানেল বসাবে যাতে বৃষ্টির জল ওই ফানেলের গা' বেয়ে বাটিতে জমতে থাকে! বৃষ্টি থামলে একটা মিলিমিটার স্কেল রেন-গজে ডোবালেই সঠিক বৃষ্টিপাতের হিসেব পাবে স্কেলের জলের দাগ থেকে। যে কোনভাবেই হোক্, তোমার রেন-গজটি অনুভূমিক হওয়া প্রয়োজন। তানাহলে হিসেবের গোলমাল হবে। আর চোঙের প্রস্থচ্ছেদ সবজায়গায় সমান হতেই হবে। ছোট শহরে যেখানে আবহাওয়া অফিস নেই, যেখানে কোন সরকারী আবাসে বা জেলখানায় রেনগজ থাকে। সেক্ষেত্রে যন্ত্রটি বাঁধানো চাতালে বসানো থাকে। তোমারা বরং রেনগজ তৈরী করে তোমাদের বিজ্ঞান ক্লাবে বৃষ্টিপাত সময়ের হিসেব রাখো। বলা বাহুল্য তোমার বাটিকাম্ চোঙটিকে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

* অসীম চক্রবর্তী

জানো কি?

(১) আকাশের রং নীল দেখায় কেন?

(ক) প্রতিসরণের জন্য (খ) বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের জন্য (গ) বিক্ষেপণের জন্য।

(২) সাপ কোন্ শ্রেণীর প্রাণী?

(ক) আভিস (খ) রেপটিলিয়া (গ) অ্যানালিডা

(৩) কোন্ স্তন্যপায়ীর রক্তে লোহিত কণিকারা নিউক্লিয়াস যুক্ত?

(ক) হরিণ (খ) উট (গ) বানর।

(৪) অ্যামকর্বিক অ্যাসিডে কোন্ ভিটামিন আছে?

(ক) ভিটামিন-এ (খ) ভিটামিন-বি

(গ) ভিটামিন-সি।

(৫) কোন পরিবাহীর রোধ তাপমাত্রার সাথে কিভাবে পরিবর্তিত হয়।

(ক) বাড়ে (খ) কমে (গ) পরিবর্তন হয় না!

(৬) কোন অ্যাসিডে কাচে লেখা যায়?

(ক) হাইড্রোক্লোরিক (খ) হাইড্রোফ্লোরিক (গ) হাইড্রজয়িক।

(৭) বজ্রপাতের আসল কারণ কি?

(ক) মেঘ ও পৃথিবীর মধ্যে বিভবান্তর (খ) স্থিরতড়িৎ আবেশ (গ) বাতাসের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা।

(৮) বর্ণালীতে প্রধান বর্ণ ক'টি?

(ক) সাতটি (খ) তিনটি (গ) দু'টি।

জানোকি'র উত্তর ঃ

(১) গ (২) খ (৩) খ (৪) গ (৫) ক (৬) খ (৭) খ (৮) খ

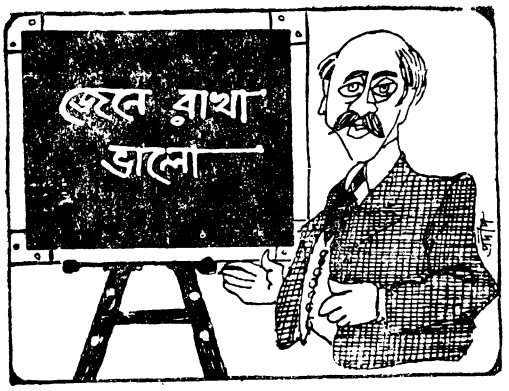

১। রেডিও তে মিডিয়াম ওয়েভ ও শর্ট ওয়েভ ব্যাণ্ডে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়— এর মানে কি ?

আকাশবাণী যে অনুষ্ঠানগুলো প্রচার করে সেগুলো আমাদের গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে বেতার তরংগ হিসাবে। যে সব বেতার-তরংগ উচ্চকম্পাংক বিশিষ্ট অর্থাৎ যাদের তরংগ দৈর্ঘ্য কম, তাদের বলা হয়। শর্ট ওয়েভ,— এদের তরংগ দৈর্ঘ্য কখনই 50 মিটারের বেশী হয় না। আবার যে সব বেতার-তরংগ তরংগদৈর্ঘ্য ৫০ মিটারের বেশী সেগুলোর কম্পাংক কম এবং এগুলোই হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভ ?

২। জ্যান্ত জিয়লমাছদের (কই, মাগুর, এসব) মাথায় নুনদিলে এরা চট্ করে মরে যায় কেন ?

এক্ষেত্রে মাছটির শরীরে জলসাম্যের ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই জলাশয়ের ব্যাপারটা নির্ভর করে জল এবং বিভিন্ন আয়ন যেমন লবণ—চলাচলের ওপর। যখনই জিয়লমাছের মাথায় নুন দেওয়া হচ্ছে, জল আর লবণের দরুণ জলসাম্যে ঘটে ব্যাঘাত—অতিরক্ত নুন ব্যপন প্রক্রিয়ায় শরীরের মধ্যে ঢুকে নুনের ঘনত্ব দেয় বাড়িয়ে। সাথে সাথে টিসু ও কোষ থেকে জল বেড়িয়ে টিসু শুকিয়ে যায় —মাছটা মারা পড়ে।

৩। ঠাণ্ডা লাগার প্রথম উপসর্গ নাক দিয়ে জল পড়া —দু তিনদিন বাদে সর্দি ঘন হয়ে হলদে হয়—এর কারণ কি ?

সর্দি লাগলে ভাইরাসগুলো শ্বাসনালীর ভেতরের গায়ে বাসা বেঁধে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। ফলে ঐ দেওয়ালের বা mucous membane এর কিছু কিছু কোষ নস্ট হয়ে যায়। এই অবস্থায় দু একদিনের মধ্যে ওই জায়গায় ব্যকটিরিয়ারা বাসা বাঁধে। এর ফলে সর্দিও চাপ বাঁধে। ব্যকটিরিয়েদের সাথে শরীরের প্রতিরক্ষা বাহিনীর অর্থাৎ শ্বেত কণিকাদের প্রবল লড়াই বাঁধে। এই হলদে কফ হোলো মরা ব্যাকটরিয়া ও শ্বেত রক্ত-কণিকাদের মৃতদেহ।

৪। কচু খেয়ে গলা ধরলে, তেঁতুলের আচার খেলে মারে কেন ?

কচুতে থাকে অকসালেটের সূক্ষ্ম টুকরো। তেঁতুলের আচারে থাকে টারটারিক অ্যাসিড। ওই জৈব অ্যাসিতে ক্যালসিয়াড ক্যালসিয়াম অকসালেটে দ্রবীভূত হয়, ফলে গলা ধরাও সেরে যায়।

৫। বাদুড় অন্ধকারে দেখে কি ভাবে ?

বাদুড় ulbasomic শব্দের প্রতিফলনদিয়ে অন্ধকারে বুঝতে পারে সামনে কোন বাধা আছে কিনা। এই ulbasonic শব্দের তরংগ দৈর্ঘ্য 3·5 মিলিমিটার থেকে 7 মিলিমিটার। বাদুড়ের আকার যত বড় হবে ulbasonic signel এ শক্তির পরিমান সেই অনুপাতে বাড়ে। গড় হিসাবে হচ্ছে প্রতি কিলোগ্রাম দেহের ওজন প্রায় $\frac{1}{10}$ ওয়াট।

৬। 'ছাতা' পড়ার ফলে পাউরুটি নস্ট হয়ে যায়। এই ছাতা জিনিসটা কি ?

পাউরুটির ছাতা আসলে একধরণের ছত্রাক বা fungus এদের চলতি নাম Pin-mould—বিজ্ঞানের পরিভাষায় mucor। এই ছত্রাকের মাথাগুলো খুদে খুদে আলপিনের মাথার মত। আসলে ওই মাথাগুলে এক একটি খুদে থলি, সময় হলে ব্যাগগুলো ফেটে অসংখ্য কণা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। উপযুক্ত জায়গা পেলেই এরা জাঁকিয়ে বসে 'ছাতা' তৈরী করবে।

৭। বৃহস্পতি পৃথিবীর কতগুণ বড় ?

বৃহস্পতির আয়তন পৃথিবীর ১৩১০ গুণ। আর ওজন দিয়ে তুলনা করলে বৃহস্পতি পৃথিবীর ৩১৮·৪ গুণ ভারি।

তোমাদের লেখা

ধূমকেতু

মালবিকা দে

কি রহস্যময়ী এই তারায় ভরা আকাশ! এই আকাশেরই রহস্যময় আগন্তুক ধূমকেতু। বহুকাল ধরে ধূমকেতুর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে নি মানুষ। বৃহৎ পুচ্ছযুক্ত নভশ্চারী ধূমকেতুকে মনে করেছে মহাপ্রলয়ের পূর্বাভাস। তার আগমনের আকস্মিকতা আরও ভয়াবহ করে তুলছে তাকে।

ধূমকেতুর কেন্দ্রস্থল অনেকটা তারার মত দেখতে। এর চারিদিকে 'কোমা' নামে গ্যাসীয় মণ্ডল। 'কোমা-র অর্থ মাথার চুল। 'কোমা' 'কোমেট' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ কেশযুক্ত তারা। ধূমকেতুর কেন্দ্রই হল তার উজ্জ্বলতম অংশ। এর পুচ্ছটি কেন্দ্রের দিকে ঘন এবং পরস্পর সন্নিবিষ্ট। এক-একটি ধূমকেতুর আবার একাধিক পুচ্ছ থাকে। বিজ্ঞানীদের ধারণা উল্কা গঠনোপযোগী পদার্থ সংমিশ্রিত অত্যন্ত সচ্ছিদ্র তুষার দ্বারা গঠিত ধূমকেতুর কেন্দ্রস্থল। এই পদার্থ লোহা, নিকেল, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সিলিকন, সোডিয়াম এবং অন্যান্য ধাতুর অতিক্ষুদ্র কণার সংমিশ্রণ। মহাজাগতিক শৈত্যে জমে যাওয়া গ্যাস, যেমন—অ্যামোনিয়া, মিথেন ইত্যাদিও ধূমকেতুর উপাদান। বর্ণালীবিশ্লেষণে এর মধ্যে হাইড্রোজেন ও হাইড্রো-কার্বনের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। অনেকের মতে ধূমকেতু 'প্রতিবস্তু' দিয়ে গঠিত। অতি বিরল বাষ্প দ্বারা গঠিত ধূমকেতুর সবচেয়ে ঘন অংশের মধ্য দিয়েও সাধারণতঃ নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায়। বাষ্পের বিরলতার জন্য সূর্যরশ্মি বাধা পায় না। তাই এর সমস্ত অংশই আলোকিত থাকে। অন্যান্য গ্রহ উপ-গ্রহের মতো ধূমকেতুর 'কলা' দেখা যায় না। সূর্যকে নির্দিষ্ট পথে পরিক্রমা করবার সময় এরা যখন তার কাছাকাছি এসে পড়ে তখন সূর্যের আলো ও তাপ এর উপাদানসমূহকে উত্তেজিত করে তোলে, তখন ধূমকেতু হয় উজ্জলতম। সূর্যোদয়ের আগে পূর্বাকাশে এবং সূর্যাস্তের পরে পশ্চিমাকাশে ধূমকেতু দেখা যায়।

বিজ্ঞানীদের অনুমান সৌরজগতে প্রায় আড়াই লক্ষ ধূমকেতু আছে। প্রতিবছর গড়ে পাঁচটি ধূমকেতু আকাশের বুকে দেখা দেয়।

সাধারণতঃ ধূমকেতুর মাথার ব্যাস হয় ২৯০০ কি. মি. থেকে ১৮½ লক্ষ কি. মি.। কোন কোন ধূম-কেতুর লেজ ১৬ কোটি কি. মি. দীর্ঘ হয়। ধূমকেতু সূর্যের কাছে এসে পড়লে তার আকর্ষণে ধূমকেতুর গ্যাসীয় কণাগুলি উৎক্ষিপ্ত হয়ে লেজের আকার ধারণ করে। ধূমকেতু যখন সূর্যের চারদিক ঘুরতে থাকে তখন তার মধ্যেস্থিত চূর্ণবিচূর্ণ পদার্থ তার

পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে আসে। সাধারণতঃ এই-ভাবেই ধূমকেতুর লেজ গঠিত হয়। ধূমকেতু সূর্য থেকে দূরবর্তী হয়ে পড়লে তার পুচ্ছ আর থাকে না। সূর্যের যত নিকটবর্তী হয় ততই এর পুচ্ছ দীর্ঘতর ও উজ্জ্বলতর হয়। সূর্য থেকে দূরে চলে যাবার সময় ধূমকেতু তার পুচ্ছকে আর গুটিয়ে নিতে পারে না—পথেই ফেলে যায়। এই ছিন্ন পুচ্ছগুলি সৌরজগতে ইতস্ততঃ ছড়ানো থাকে। যে ধূমকেতুগুলিকে কেবল দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায়, সেগুলির সাধারণতঃ থাকে না।

প্লুটোর কক্ষবৃত্ত হল সৌরজগতের সীমানা। ধূমকেতুরা সাধারণতঃ এই সীমা ছাড়িয়ে চলে যায়। কয়েকটি আবর নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফিরেও আসে। বিশাল কক্ষপথে চলতে চলতে ধূমকেতু যখন সৌর-জগতের মধ্যে এসে পড়ে,সূর্য তখন তাকে নিজের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। সূর্যের আকর্ষণের জন্য তাকে একবার প্রদক্ষিণ করে ধূমকেতু নিজের কক্ষ পথ ধরে এগিয়ে যায়। কোন কোন ধূমকেতু সূর্যের বশ্যতা স্বীকার করে সূর্যকেই প্রদক্ষিণ করে। অনেক সময় বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন প্রভৃতি গ্রহের আকর্ষণেও ধূমকেতু সৌরজগতের বাসিন্দা হয়ে যায়।

ধূমকেতুর কক্ষপথ উপবৃত্তাকার অথবা অধিবৃত্তাকার হয়। যেগুলির কক্ষ বৃত্তাভাস, কেবল সেগুলিই প্রত্যাবর্তন করে। পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘূর্ণায়মান এই ধূমকেতুগুলিকে নিয়মিত ধূমকেতু বলে। কিছু কিছু ধূমকেতু পথেই নিঃশেষিত হয়ে অণুপরমাণুতে রুপান্তরিত হয়। কতকগুলি আবার ঘুরতে আকাশের কোন্ সুদূর প্রান্তে চলে যায়—আর ফিরে আসে না। এই ধরণের ধূমকেতুকে অনিয়মিত ধূমকেতু বলে। এদের অর্ধেক পশ্চিম থেকে পূর্বে পরিক্রমণ করে।

পৃথিবীর মানুষ ধূমকেতু দেখেছে অনেক। তাদের অনেকের লেজ বড়, মাথা ছোট কিংবা লেজ ছোট, মাথা বড়, ধূমকেতুর আগমনের পর যে সমস্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে তার জন্য ধূমকেতুই যেন দায়ী। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে একটি ধূম-কেতুকে এক বছর ধরে দেখা গিয়েছিল। তার লেজটাও কম বড় ছিল না—১৫-২০ কোটি মাইলও হতে পারে। আবার ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে ড্য শীজোর ধূমকেতুর ছিল ছ'টা লেজ। লেজই তো ধূমকেতুর সর্বস্ব নয়, তার একটা শরীরও আছে। প্রায়ই সেটা পৃথিবীর চাইতে বড় হয়। ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে যে ধূমকেতু দেখা গেল তা সূর্যের চেয়েও বড় ছিল। তার লেজটিই ছিল তার ৫০ গুণ। ধূমকেতুর যখন-তখন আসা, তার উপর তার অদ্ভুত চেহারা, আবার তার লম্বা লেজের ঝাপটা লেগে পৃথিবীটা খান্‌খান্ হয়ে যায় বুঝি—এই ভেবে সেকালে লোকে ভয়েই তটস্থ হয়ে থাকত। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে হ্যালীর ধূমকেতু আসার সময় হিসেব করে দেখা গেল যে তার লেজের ঝাপটা পৃথিবীতে লাগবে। এবার বুঝি পৃথিবীর আর রক্ষে নেই। কিন্তু শেষে কখন যে ধূমকেতুর লেজ পৃথিবীকে ঝাঁট দিয়ে চলে গেল কেউ তা বুঝতেও পারল না। নিউটনের বন্ধু ছিলেন হ্যালী। তিনি হিসেব করে বললেন কিছু কিছু ধূমকেতু নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফিরে আসে। ১৬৮২ খ্রীস্টাব্দে আসা ধূমকেতুকে দেখে তিনি বলেছিলেন সেটা ৭৬ বছর পরে আসবে। হলও তাই—১৭৫৯- গোড়ার দিকে দেখা গেল ধূমকেতুকে—তার নাম রাখা হল হ্যালীর ধূমকেতু। সেটাই ১৯১০-এ এসেছিল,১৯৮৬-তেও আবার আসবে।

বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি বড় বড় গ্রহেয় টানে

কিছু কিছু ধূমকেতু সৌরজগতে থেকে যায়। বৃহস্পতির টানে রয়েছে এরকম তিরিশটি ধূমকেতু। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে বৃহস্পতির সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত পথে সঞ্চরমাণ এমন তিনটি ধূমকেতুর একটি পরিবার আছে। সাধারণতঃ কোন গ্রহের পাশ দিয়ে ধূমকেতু যাওয়ার সময়ই এরকম পরিবার গঠিত হয়। সূর্য থেকে ন্যূনতম দূরত্বের মাত্রাধিক্য এবং কক্ষপথের স্বল্প অবনতিই এরকম পরিবার গঠনের কারণ। হ্যালীর ধূমকেতু নেপচুনের টানেই বারবার ফিরে আসে। এন্‌কে-র ধূমকেতু বুধের টানাটানিতে ৩$\frac{1}{3}$ বছর অন্তরই ফিরে আসে। বড় বড় গ্রহের পাল্লায় পড়ে অনেকের লেজ ছিঁড়ে গেছে, দেহ দু-টুকরো হয়ে গেছে। এদের একটি হচ্ছে বায়েলা-র ধূমকেতু। সেটি আসত পৌনে সাত বছর পর পর। কিন্তু ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন সে এল দেখা গেল তার লেজ নেই—দেহের মাঝখানটা সরু হয়ে গেছে। তারপর একদিন সে দু-টুকরো হয়ে গেল। ১৮৫২-এ যখন সে এল তখন তার দেহের একটি টুকরো অপরটি থেকে অনেক দূরবর্তী হয়ে পড়েছে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৭এ নভেম্বর তার আসার দিন ছিল। সেদিন দেখা গেল আকাশে আগুনবৃষ্টি হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বুঝলেন বায়েলা-র ধূমকেতু ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ১৯০৮ সালে ৩০-এ জুন ভোর ৭টায় সাইবেরিয়ার তুঙ্গস্ক নদীর কাছে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। এর আগেই স্থানীয় লোকেরা আকাশে এক বিরাট আগুনের গোলা দেখতে পায়

এমন করে কত ধূমকেতু এসেছে কত গেছে, কেউ ধরা পড়েছে মানুষের চোখে, কেউ পড়েনি—হয়তো মহাকাশের কোন্ সুদূর প্রান্তে গিয়ে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেছে। কেউ তা জানে না। বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের সমস্ত জিজ্ঞাসা এই আকাশকে কেন্দ্র করে।

পরের সংখ্যায়...

পরের সংখ্যা থেকে শুরু হচ্ছে হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের বিজ্ঞানভিত্তিক রহস্যোপন্যাস **সে আসছে!** এবং পার্থসারথি চক্রবর্তীর **ক্ষুদে বিজ্ঞানীর প্রজেক্ট**।

বিমলেন্দু মিত্রের দারুণ মজার **'বঙ্কুবাবুর গল্প'** পাতালপুরীর কথা/সূর্য স্থির-পৃথিবীই ঘুরছে/বিশ্ব-জুড়ে বিচিত্র প্রাণ/বাতিঘরের আদিকথা/চিন্তা করি কেন?/জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস—এই সব এবং আরো অনেক কিছু নিয়ে লেখা।

...পরের সংখ্যা বেরুচ্ছে ফেব্রুয়ারীর গোড়ায়...

'আর্কিমিডিস'—পাঁচ অক্ষরের এই নামটি শুনলে বিজ্ঞানী সমাজ আজও শ্রদ্ধায় মাথা নত করে। তোমরা তো প্রায় সকলেই কপিকল, লিভার, কর্ক-স্ক্রু বিষয়ে তার আবিষ্কার ও আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ে তার গুরুত্ব শূর্ণ তত্ত্ব সেই ছোট্টবেলার থেকে শুনে আসছ। কিন্তু আপন ভোলা এই মানুষটির শুধু ভৌত বিজ্ঞানেয় নয় গণিতেও ছিল অসামান্য অবদান। তাই বিদগ্ধ সমাজে তার আর এক নাম 'জ্যামিতি শাস্ত্রের হোমার'। তখনকার দিনে কেউ বৃত্তের সঠিক ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার সঠিক পদ্ধতিটি জানতেন না। আর্কিমিডিস তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি প্রয়োগ করে বৃত্ত, গোলক, অধবৃত্ত, পরাবৃত্তের ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় করেন। এছাড়াও বহুদিন পর্যন্ত নানা আকার ও আয়তনের ঘনবস্তুর ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয়ের নানা সমস্যা নিয়ে মেতেছিলেন গবেষনায়। যে সময়ের কথা বলছি সে যুগে গ্রীক অঙ্ক পদ্ধতি ছিল এমন ধারার যে অনেক বড় কোন সংখ্যাকে এই অঙ্কপদ্ধতিতে প্রকাশ করা যেতনা। আর্কিমিডিসই প্রথম এই অসুবিধে দূর করেন, তিনি আবিষ্কার করলেন এমন এক অঙ্কপদ্ধতি যাতে বিশাল বিশাল সংখ্যাকে খুব সহজেই প্রকাশ করা যায়। গণিত বিষয়ক তাঁর গবেষণার থেকেই—পরবর্তীকালে জন্ম নিয়েছি—লগারিথিম, Integral calculus। বর্গমূল নির্ণয়ের পদ্ধতিও তাঁরই চেষ্টা প্রসূত। জ্যামিতির বিভিন্ন ফিগার সম্বন্ধে তিনি বহু বই রচনা করে গিয়েছেন তোমরা জানোকি পৃথিবীর এই মহানবৈজ্ঞানিক নির্মম মৃত্যুকেও বরণ করেছিলেন গণিতেরই এক জটিল সমস্যার সমাধান করতে করতে। গ্রীক শহর সিরেকাস তখন সবে রোমান সেনাপতি মার্থেলস দখল করেছেন। ইতিমধ্যে মার্থেলস শুনেছেন আর্কিমিডিসের কথা। এই জ্ঞানতপস্বীর সাধনায় মুগ্ধ মার্থেলস মিরেকাস অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের আদেশ দিলেন—যেখান থেকে পারো খুঁজে নিয়ে এসো অনন্য সাধারণ সেই বৈজ্ঞানিককে ; কিন্তু দেখো তার যেন কোন ক্ষতি না হয়। রোমান সৈন্যরা খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে হাজির হলেন এক জায়গায়—আর্কিমিডিস তখন সেখানে বালি ছড়িয়ে তার উপর নানা আকারের দাগ কেটে—এক জটিল সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত। তিনি জানতেও পারেননি কখন রোমান সৈন্যরা তার প্রিয় জন্মভূমিতে প্রবেশ করেছে। এক রোমান সৈন্য জিজ্ঞাসা করল 'আপনার নাম কি ! '—বিরক্ত আর্কিমিডিস বললেন 'অপেক্ষা করো, আমার সমস্যার উত্তরটা আগে পাই। আর যাই করো আমার এ বৃত্তটাকে তোমরা নষ্ট করোনা' সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞ, অসহিষ্ণু রোমান সৈন্যের অস্ত্রাঘাতে সেই রোখাঙ্কিত বালির উপর আঁক কষতে কষতেই চির-দিনের মতো ঘুমিয়ে পড়লেন পৃথিবীর এক বিস্ময়কর প্রতিভা।

আজ যা ঘটনা কাল তাই ইতিহাস। সময়ের ইতিহাস অতীত, বর্তমান সবকিছুর সাক্ষী থাকলেও কালো কালো অক্ষরের মাঝে যে ইতিহাসের জন্ম হয় সে ইতিহাসে লেখা থাকে না এমন অনেক মানুষেরই কথা, এমন অনেক ঘটনার কথা যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। বিশ্ববিখ্যাতদের নামের তলায় চাপা পড়ে যায় বহু অখ্যাতদের নাম—সাধারণ মানুষের কাছে তারা চির অজানাই রয়ে যান। এমনই এক

মানুষ রাধানাথ শিকদার। বাঙালী এই যুবকটি কাজ করতেন ভারতীয় জরিপ বিভাগে। অঙ্ক কষতে তিনি বড়ো ভালোবাসতেন। ১৮৫২ খীষ্টাব্দে—একদিন অফিসে বসে অঙ্ক কষতে কষতে আবিষ্কার করে বসলেন এক অজানা তথ্য। আনন্দে আত্মহারা মানুষটি ছুটে গেলেন ওপরওয়ালা সাহেবের কাছে—'স্যার, আমি আজ পৃথিবীর সব চাইতে উঁচু শিখরটির কথাজানতে পেরেছি।" অঙ্ক কষে রাধানাথ শিকদার প্রমান করলেন তার তথ্য নির্ভুল। কিন্তু পৃথিবীর সব চাইতে উঁচু শিখরটির নাম কি রাখা যায়? রাধানাথ চূড়া? কিন্তু না, নাম রাখা হলো ওপর-ওয়ালা সাহেব জর্জ এভারেস্টের নামে মাউন্ট এভারেস্ট। এভারেস্ট সাহেবের নামের আড়ালে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল প্রকৃত আবিষ্কারক রাধানাথের নাম। শুধু রাধানাথ শিকদারই নন এমন বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষে আরও বহুজন।

(২)

১৮৪৭ খীস্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী—আমেরিকার ওহিও প্রদেশের মেনলোতে জন্ম হলো এক শিশুর, মা বাবা আদর করে নাম রাখলেন টমাস আলভা এডিসন। তখন কি কেউ জানত এই শিশুই একদিন বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হবে 'মেনলো পার্কের যাদুকর' নামে। স্কুলে তিনমাসের বেশি পড়াশুনোর সুযোগ আলভার মেলেনি। কিন্তু ছোট্টবেলার থেকে তার সবকিছুতেই ছিল অদম্য আগ্রহ, উৎসাহ, খুঁটিয়ে জানবার প্রবল তৃষ্ণা। যে বয়সে ছোট ছেলেরা জিনিসপত্র ভেঙে টুকরো করে সেই বয়সে আলভা ছিল আর সকলের ব্যতিক্রম। হাতের কাছে কাঠের টুকরো, লোহার টুকরো যা পেতেন তাই নিয়ে বসে যেতেন, আপ্রাণ চেষ্টা করতেন কিছু একটা করার। তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল এত তীব্র! একদিন একটা মুরগীকে ডিমের উপর বসে থাকতে দেখে আলভা জিজ্ঞাসা করে বসল, 'মা মুরগীটা কি করছে?' মা বললেন 'ও ডিমে তা দিচ্ছে, তা দিলে ফুটে বাচ্চা বেরুবে'। শুনে কি চুপ করে থাকার ছেলে আলভা? ঘরে খাবারের জন্য যত ডিম ছিল জড়ো করে তার উপর বসে পড়লেন। ডিমগুলো তো ভেঙে চৌচির। মার কাছে বকুনি খেয়েও তার মনে জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। তার মনে প্রশ্ন 'একটা ছোট মুরগী যা পারে আমি কেন তা পারব না?' এরপর তার জীবন শুরু হয় খুব নাটকীয়ভাবে—ট্রেনে, ষ্টেশনে খবরের কাগজ, সাময়িক পত্রিকা, পিপারমেণ্ট, এইসব ফেরি করতে শুরু করেন। মাত্র পনের বছর বয়সে চলন্ত গাড়ীতে এক ছাপাখানা তৈরী করে 'ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস' নামে এক পৃষ্ঠার এক সাপ্তাহিক কাগজ বের করেন, যাত্রী দের কাছে এই কাগজ বেচে যা পেতেন তাতে তার খরচা কুলিয়ে যেত। একদিন মাউণ্ট ক্লিসেন্স ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ বিক্রি করছিলেন, হঠাৎ চোখ গেল রেললাইনের উপর। রেললাইনের উপর তখন নিজের খেলায় মত্ত একটি ছোট ছেলে, তার উপর দিয়ে তখন ছেলেটির দিকে ছুটে আসছে সাক্ষাৎ মৃত্যু। এক মুহূর্ত দেরী না করে আলভা ছুটে গিয়ে শিশুটিকে রাস্তা পার করলেন! ছেলেটি ছিল ষ্টেশনমাষ্টারেরই ছেলে। কৃতজ্ঞ ষ্টেশনমাষ্টার আলভার ইচ্ছানুযায়ী তাকে টেলিগ্রাফের কাজ শেখবার সুযোগ করে দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। তারপর এই কিশোরটি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের কাজে নিয়োজিত করলেন। একে একে আবিষ্কার করলেন ফোনোগ্রাফ চলচিত্র, আধুনিকযুগের বিজলী বাতি, নতুন ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন যন্ত্র। * রীতা চৌধুরী

ধাঁধাঁ

মুখে বলে ভাই ভাই বদমাস বিচ্ছু
ক্ষতি ছাড়া ভাল কাজ করে নাকো কিচ্ছু।
সবখানে আছে ভাই, যে দিকেই চাইরে
জীব না কি জড় সেটা—ভেবে ফল নাইরে।
ঢুক্‌লেই শরীরে, দলে বাড়ে চটপট
হাঁচি, কাশি, সর্দ্দিতে রোগী করে ছটফট।
ফাঁকি দেয় ওষুধকে ডাক্তারে মানে হার
চটপট ভেবে বল—কি হবে যে নাম তার ?

গত মাসের ধাঁধার উত্তর : 'লিথিয়াম'

সঠিক উত্তর দাতাদের নাম—

শৈবাল দত্ত, তমাল দত্ত, গোবরডাঙ্গা ; অচিনকুমার ঘোষ, হাওড়া ; বাসব দাস, ২৪ পরগণা ; অতিন রক্ষিত, হুগলী ; মিতা দত্ত, হাওড়া ; শিউলি চ্যাটার্জ্জী, যাদবপুর ; মধুমিতা দাস, চুঁচড়া ; বনমালী দত্ত, শেওড়াফুলি ; কাকলী মিত্র, কলি-৫৩।

বিজ্ঞানমেলার তরফ থেকে

৺কৃষ্ণা ঘোষাল স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা

আহ্বান করা হচ্ছে

রচনার বিষয় : প্রাণীজগতের বিচিত্র আচার আচরণ

প্রথম পুরস্কার : ২৫ টাকা

দ্বিতীয় পুরস্কার : ১৫ টাকা

তৃতীয় পুরস্কার : ১০ টাকা

১৮ বছর বয়সের মধ্যে যে কোনও প্রতিযোগী এতে যোগ দিতে পারে। রচনার শব্দসংখ্যা ২৫০এর মধ্যে হওয়া চাই।

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ : ১৫ই মার্চ ১৯৮৩

বর্ণানুক্রমিক সূচী

দ্বিতীয় বর্ষ ১৯৮২/ ১৩৮৮।৮৯

অ

অন্ধজনে……, ৩৪
অক্টোপাস হিউমেলিস্থি, ১৪৪
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যদি পাল্টাতেই হয়, ২৫৫
অবিশ্বাস্য ! ৩১২

আ

আশ্চর্য পাখি—হাতি পাখি, ৬৭
আকাশ ভরা সূর্য তারা, ৯১, ১২৬, ১৯৯, ২৩৭, ২৭২
আজব মাছ, ২৮৫
আছে তাই হচ্ছে, ৩৩২
আপেল ফল না পড়লেও… ৩০৩

উ

উল্টো ফ্যাসাদ, ১১০

এ

এরেম, ৩৭১

ক

কৃত্রিম হৃদপিণ্ড, ২
ক্রিং, ক্রিং, বাজে ঐ, ৬৮
কালবোশেখীর ঝড়, ১৩৭
কার্টুন, ১২৭
কোনো সময়ে… ৪৮, ১৭৯, ২৩৬
কুবেরের ধন খুঁজতে গিয়ে, ২৪৯
কোনটা হবে হেড না টেল ?, ৩৫১

খ

খুদে বৈজ্ঞানিক ৩২৬
খুশি মতো আবহাওয়া, ২৯১

গ

গুটি বসন্ত ও ডঃ জেনার, ৩৪
গরিলা কি সত্যিই ভয়ঙ্কর ? ২৭৬
গন্ধদূত, ৩৮৪

চ

চাঁপা ফুলের গন্ধ, ৩৪৮
চাঁদের মূর্তি, ৩৯৩
চীনামাটির কথা, ৩২৭

ছ

ছলনাময়ী, ৩৫৬

জ

জানো কি ?, ২২, ৪২ ১৯৬, ১৪১, ১৮০, ২১৬, ২৫২, ১৮৮, ৪১৬
জন্মের আগে জন্মটীকা !, ১৬৪
জেনে রাখা ভালো, ২৪৭, ২৮৩

ট

টাকথেরাপি, ৪
টেকটাইটের রহস্য, ১৩৯
টি. বি ও রবার্ট কক, ২২৭

ড

ডক্টর টি. কে. সি নিখোঁজ হলেন, ১৮৬
ডাকাত ধরা গাড়ী, ১৮২

ত

ঘরে দাম !, ২

তারাপদবাবুর জীবনের একটি দিন, ৩৪১
তিন নম্বর চোখ, ৩৫৩
ত্রিমূর্তি সম্মেলন, ৩৮৫

থ

থালীসের গাথা, ৯৮, ১২১, ১৫৭, ১৯৬

দ

দুধের ইট, ৬১
দি অরিজিন অফ্ স্পেসিস ও ডারউইন, ৪৫
দাঁড় কাকের অত্যাচার !, ২৫৪

ধ

ধাঁধা, ৩৬, ৭২, ১০৮, ১৪৪, ১৮০, ২১৬, ২৫২, ২৮৮, ৪১৬
ধাতুর মধ্যে যাদুর খেলা, ২৪১

ন

নিজে করো, ২৯, ৭১, ১০২, ১৪২, ১৭৯, ২১৩ ২৫১, ২৮৭
নতুন রাডার, ১১০
নতুন গ্রহ—কিয়েড, ২৯১
নতুন কাজে কৃত্রিম উপগ্রহ, ২৯২

প

পিপড়ে পুরান, ২৫, ৪৯, ৭৯, ১২৪, ১৭৭, ২০৭ ২২৫, ২৬৫
পড়ুয়ার দপ্তর, ৩০, ৬৯, ১০৫
পেট্রোলের বদলে কয়লা, ৩৮
পাখিদের ভাবনা, ১১১
পাথরের চোখ, ১১৫
পাগলাচণ্ডীর পাগলামি, ২৪৩, ২৬৯
পেট্রোলের বদলে মিথেন, ২২১
পেটের গ্যাস, ২৭৯
পুরনো পাণ্ডুলিপি হারানো পাহাড়, ৩৪৪
পাখির ঠোঁট, ৩১৬
পঞ্জিকা নিয়ে গণ্ডগোল, ৩২২

ফ

ফ্রেডারিক উইলিয়াম হারশেল, ৮৩

ব

বিশ্বজুড়ে বিচিত্র প্রাণ, ১৫, ৪৬, ৭৭, ১৩৫, ১৭৩, ২১১, ২৩১, ২৬৩
বরাহমিহির, ২৭
বাঙালী বিজ্ঞানীর আবিষ্কার, ৩৫
ব্যবসা করার সহজ উপায়, ৩৯
বেঁটে থেকে লম্বা, ৭৪
ব্রহ্মগুপ্ত, ১১৩
বঙ্কুবাবুর গল্প, ১৫১, ৩৬৪
বইপড়া যন্ত্র ! ১৮২
বৃহস্পতির তাপবলয় ১৮২
ব্যাঙের সভা, ২৮৬
বহুরূপী, ৩৬০
বাচ্চারা যখন পড়তে শেখে, ২৯১

ভ

ভাস্কর—২, ২
ভিটামিনের অপকারিতা, ১৮২
ভবেচিন্তে পা বাড়াও !, ২৫৫
ভোরের স্বপ্ন কি সত্যি হয় ? ৩১৩
ভাইরাসের বিরুদ্ধে, ২৯২

ম

মনের জানালা, ১৭, ৫৯, ৮১, ১১৯, ১৬৩, ২০৯, ২২৯, ২৬৭
মহাকাশের গাঁট্টা, ৯৩
মাইকেল ফ্যারাডে, ১৪৩
মোমের কাহিনী, ১৭১
মঙ্গলের আকাশে এরোপ্লেন, ২৯৮
মহাকাশের আগন্তুক, ৩৮৫
মহাকাশ বিজয়ের পঁচশবছর, ২৯৩
মেরুর ফুলঝুরি, ৩৯০

য

যা নিয়ে এখন হৈ চৈ, ৪০, ৭৬ ১১২, ১৪৮, ২২০ ২৫৬
যে ইঁদুর লোহা খায়, ৯৬

যদি চিমনি না থাকতো, ১১০
যেখানে দেখিবে ছাই··· !, ১৪৬
যুদ্ধ কেন থামলো ?, ৩৬১
যে জল বরফ হয় না, ৩১৯
যন্ত্র গণক—যন্ত্রমানব, ৩২৫

র

রোব্বোস, ১৯, ৫১, ৮৫, ১২৯ ১৬৫, ১৯৩।
রোগ সারাতে পোকামাকড়, ৫৫
রেডিয়ামের কথা, ১০৭
রঙ্ ক্যালেণ্ডার, ১০৭
রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন কি আজগুবি গল্প, ১৮৩
রক্তাল্পতা বনাম বুদ্ধি !, ২১৯
রোগ ছড়ানোর ওস্তাদ, ৩৮১

ল

লিমেরিক, ৭৫
লাইনবিহীন রেলগাড়ি !, ২১৯

শ

শীতের আকাশ, ১০
শীতের মরশুমে খাওয়া দাওয়া, ২৩
শরীর স্বাস্থ্য, ১৩, ৫৭, ১০৩, ১৩২, ১৪৯, ২০৫, ২৩৯ ২৮১।
শক থেরাপি, ৬৩
শিলাবৃষ্টি, ১৫৬
শতবর্ষের আলোয় ম্যাক্স বর্ণ, ১৯১
শ্রম এবং হৃদযন্ত্র !, ২১৩
শয়তান মাছ, ২৪৮

স

সূর্যপাড়ি, ৩
সোয়াবিনের ভালো খারাপ, ৩৮
সৌরশক্তি ও কৃত্রিম উপগ্রহ, ৩৮
সমুদ্র থেকে সোনা, ৮৯
সৌর রেফ্রিজেরেটার, ৭৪
স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কারের পেছনে, ১৭৫
স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক চক্ষু ২১৪
সাইবেরিয়ার সারস, ২২৩
স্পঞ্জ – ওয়াচ ! ২৫৫
সাগর রহস্য, ৩০৮
সাইক্লোনের দাওয়াই, ৩৬৯
সরষের তেলে ভেজাল, ৩৮০

হ

হিমাইৎগঞ্জের নবাবজাদা, ৫
হাই ওঠে কেন, ৩২
হিমবাহ, ৪১
হায় গ্যালিলিও ! ১৪৬
হাতিয়ার থেকে যন্ত্র, ১৬৮ ২০২, ২৩৩, ২৬০, ৩২৯
হীরের কথা, ২৬৭
হাবুলের ক্যালকুলেটর, ৩৮৫

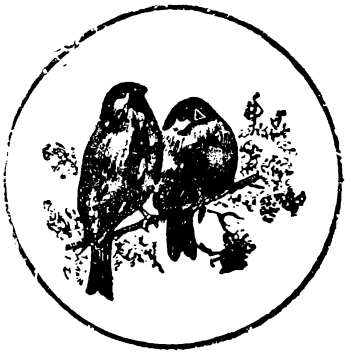

প্রস্তুতির পথে

শ্রীরামপুর স্টাডি ইনষ্টিটিউশন

কে, এম, সাহা স্ট্রীট, শ্রীরামপুর

BIJNAN MELA JANUARY 1983 Rs. 2.25

Post Regd. WB/SC—200 Vol. 3 No. 1 Regn. No. R. N. 37306/81

নতুন সুর ও ছন্দে!

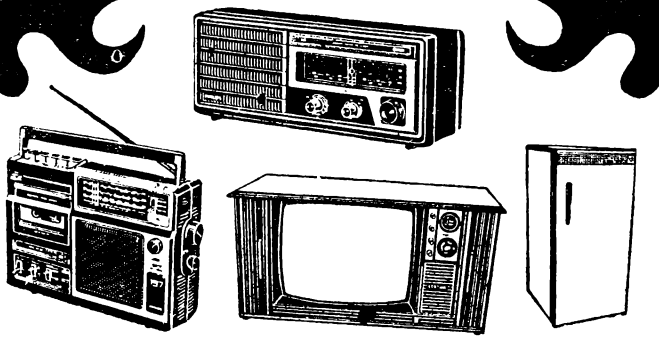

অনুমোদিত ডিলার: ফিলিপ্‌স, এইচ.এম.ভি, ভল্টাস, জেম, টেলেরামা, ভারত, কেলট্রন, আপট্রন, সোনোডাইন, ক্রাউন, টেলির‍্যাড ইত্যাদি।

সঙ্গে নিন ফিলিপ্‌স অনুমোদিত সার্ভিস সেণ্টারের বিশেষ সুবিধা।

STUDIO

সুরবাণী

১০০ ভূপেন বোস এভিনিউ কলিকাতা-৭০০ ০০৪

ফোন-৫৪-১৮৩১

Published by Ashim Chakraborty from 173, Ashokgarh, Cal.-700035 and Printed by Satyanarayan Press 1, Ramaprasad Roy Lane, Cal -700006 and Cover Printed by Perfect Press, 32A, Patuatola Lane, Cal.-9